উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

দূরশিক্ষা অধিকার

স্নাতকোত্তর বাংলা

দ্বিতীয় সেমেষ্টার

অনুবাদ সাহিত্য

কোর পত্র - ২০৪

পর্যায় - ক

UNIVERSITY OF NORTH BENGAL

Postal Address:

The Registrar,

University of North Bengal,

Raja Rammohunpur,

P.O.-N.B.U., Dist-Darjeeling,

West Bengal, Pin-734013,

India.

Phone: (O) +91 0353-2776331/2699008

Fax: (0353) 2776313, 2699001

Email: regnbu@sancharnet.in ; regnbu@nbu.ac.in

Wesbsite: www.nbu.ac.in

First Published in 2019

All rights reserved. No Part of this book may be reproduced or transmitted, in any form or by any means, without permission in writing from University of North Bengal. Any person who does any unauthorised act in relation to this book may be liable to criminal prosecution and civil claims for damages.

This book is meant for educational and learning purpose. The authors of the book has/have taken all reasonable care to ensure that the contents of the book do not violate any existing copyright or other intellectual property rights of any person in any manner whatsoever. In the even the Authors has/ have been unable to track any source and if any copyright has been inadvertently infringed, please notify the publisher in writing for corrective action.

পর্যায়ভিত্তিক আলোচনা

পর্যায় ঃ ক

একক-১ মধ্যযুগীয় বাংলা অনুবাদ সাহিত্য সৃষ্টির প্রেক্ষাপট, অনুবাদ সাহিত্য সৃষ্টির কারণ

একক-২ কৃত্তিবাসী রামায়ণের কবি পরিচয় কৃত্তিবাস সমস্যা বাল্মীকি ও কৃত্তিবাসী রামায়ণের তুলনা, সংস্কৃত রামায়ণের গুরুত্ব

একক-৩ কৃত্তিবাসের কাব্যকাহিনীর মৌলিকতা ও মূলানুগত্যের পরিচয়, চরিত্র বিচার, রস বিচার এবং অনুবাদক হিসেবে কৃত্তিবাসের অবদান

একক-৪ কৃত্তিবাসী রামায়াণে বাঙালিয়ানার প্রভাব, ভাষা ছন্দ ও অলঙ্কারের কৃতিত্ব ও ভক্তিবাদ

একক-৫ ভাগবতের অনুবাদ, কাব্য কাহিনীর উৎস ও পরিচয়, রচনাকাল ও গৌড়েশ্বর প্রসঙ্গ

একক-৬ মালাধর বসুর কবিত্ব, বাঙালিয়ানা কবিপ্রতিভা ও কাব্যের মূল্যায়ন

একক-৭ ভাগবত অনুবাদ কম হওয়ার কারণ, অনুবাদক হিসেবে মালাধর বসুর বিশেষত্ব, মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণবিজয় ভক্তি প্রসঙ্গ, মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে ঐশ্বর্যলীলাই মুখ্য মধুর লীলা গৌণ

পর্যায় ঃ খ

একক-৮ অনুবাদে মহাভারত, কাশীদাসী মহাভারত ও কাব্যরচনার উৎস

একক-৯ মহাভারতের অনুবাদক হিসেবে কাশীরাম দাসের পরিচয়, কাশীদাসী মহাভারতের রচনাকাল, কাশীদাসী মহাভারতের কাব্যবৈশিষ্ট্য

একক-১০ কাব্যগত আবেদনে কৃত্তিবাসী রামায়ণ ও কাশীরাম দাসের মহাভারত, কবিত্ব পরিচয়, কৃত্তিবাসী রামায়ণ ও কাশীদাসী মহাভারতের প্রামাণিকতা

একক-১১ কাশীদাসী মহাভারতে শিল্পরীতি, বাঙালিয়ানার অভাব ও পরবর্তী বাংলা কাব্য

একক-১২ মুসলিম সাহিত্য, সপ্তদশ শতাব্দীর মুসলমান কবিদের কৃতিত্ব, সপ্তদশ শতকের চট্টগ্রাম রোসাঙের দরবারি সাহিত্য

একক-১৩ পদ্মাবতী কাব্যের কাহিনী প্রসঙ্গ, কবি পরিচিতি, মাগন প্রসঙ্গ, কাব্যের উৎস, রসবিচার, পদ্মাবতী রূপক না রোমান্স কাব্য।

একক-১৪ আলাওলের ধর্মবোধ ও পদ্মাবতী কাব্যে সুফী প্রভাব, কাব্যের ঐতিহাসিকতা, পদ্মাবতী কাব্যের ভাষা ও ছন্দ, সমাজ সংস্কৃতি, পদ্মাবৎ ও পদ্মাবতীর তুলনা, পদ্মাবতী কাব্যে গান।

কোর পত্র - ২০৪ অনুবাদ সাহিত্য

পর্যায় ঃ ক

একক-১

ভূমিকা, মধ্যযুগীয় বাংলা অনুবাদ সাহিত্যের প্রেক্ষাপট, অনুবাদ সাহিত্য সৃষ্টির সম্ভাব্য কারণ

একক-২

কবি পরিচয়, কৃত্তিবাস সমস্যা, বাল্মীকি রামায়ণ ও কৃত্তিবাসী রামায়ণের তুলনা, সংস্কৃত রামায়ণের গুরুত্ব

একক-৩

কাহিনী বিন্যাসে কৃত্তিবাসের ঋণ,কাহিনী বিন্যাসে কৃত্তিবাসের মৌলিকতা ও মূলানুগত্যের পরিচয়, কৃত্তিবাসী রামায়ণের চরিত্র বিচার, কৃত্তিবাসী রামায়াণের রস বিচার, রামায়াণ অনুবাদক হিসেবে কবি কৃত্তিবাসের অবদান

একক-৪

কৃত্তিবাসী রামায়াণে বাঙালিয়ানার প্রতিফলন, কৃত্তিবাসী রামায়াণে ভাষা, ছন্দ ও অলংকারের কৃতিত্ব, কৃত্তিবাসী রামায়ণে ভক্তিবাদের প্রভাব

একক-৫

ভাগবত অনুবাদ, কাব্য কাহিনীর উৎস ও কাহিনী পরিচয়, কবি পরিচয়, কাব্য রচনাকাল ও গৌড়েশ্বর প্রসঙ্গ

একক-৬

মালাধর বসুর কবিত্ব ও কাব্যপরিচয়, মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণ বিজয় কাব্যে বাঙালিয়ানা, কবিপ্রতিভা ও কাব্যের মূল্যায়ন, শ্রীকৃষ্ণ বিজয় মালাধর বসুর স্বাধীন রচনা

একক-৭

ভাগবত অনুবাদ কম হওয়ার কারণ, অনুবাদক হিসেবে মালাধর বসুর বিশেষত্ব, শ্রীকৃষ্ণ বিজয় কাব্যে ভক্তি প্রসঙ্গ,শ্রীকৃষ্ণ বিজয়ে ঐশ্বর্যলীলাই মুখ্য মধুরলীলা গৌণ

একক ১। মধ্যযুগীয় বাংলা অনুবাদ সাহিত্য সৃষ্টির প্রেক্ষাপট, অনুবাদ সাহিত্য সৃষ্টির কারণ

বিন্যাসক্রম

১.১। ভূমিকা

১.২। মধ্যযুগীয় বাংলা অনুবাদ সাহিত্য সৃষ্টির প্রেক্ষাপট

১.৩। অনুবাদ সাহিত্য সৃষ্টির সম্ভাব্য কারণ

১.৪। আত্মমূল্যায়নধর্মী প্রশ্ন

১.৫। সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

১.১। ভূমিকা

সাহিত্য একইসঙ্গে ব্যক্তি-নির্ধারিত এবং সমাজমুখী। ব্যক্তি অর্থাৎ স্রষ্টা সমাজবিচ্ছিন্ন নয় বলেই, সামাজিক আন্দোলন ও তার ভিন্নাত্মক গতি প্রকৃতিকে সাহিত্যে প্রতিফলিত করেন। আবার সময় এবং সমাজ অবিচ্ছিন্নভাবে অথচ পরিবর্তনশীলতার পথে সাহিত্যের প্রকৃতি নির্ধারণ করে বলেই সাহিত্যেরশ্রেণি বিচিত্র। তাই এমন সময় এবং সমাজ আসে, যখন চিন্তার উন্নততর স্তরে অবস্থান করে মৌলিক সৃষ্টি গড়ে ওঠে না। অন্য ভাষার মহান ও বৃহৎ আদর্শের কাছে হাত পেতে দাঁড়াতে হয়। সংস্কৃত ভাষায় রচিত রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবতের বাংলা ভাষায় অনুবাদ একই সঙ্গে অনেকগুলি প্রশ্ন ও ভাবনার পথ উন্মুক্ত করে দেয়। তখন সমাজ তুর্কী আক্রমণে বিপর্যস্ত। তাদের চণ্ডনীতির ফলে সমাজের শান্তি, চিত্তের স্থিতি বিঘ্নিত হয়। কিন্তু প্রাথমিক ঝটিকা প্রহার অসহ্য ঠেকলেও কালের নিয়মে পরবর্তী ক্ষেত্রে তা সহনশীল হয়ে ওঠে। চতুর্দশ শতাব্দীতে বিদেশী মুসলমানেরা এদেশের জলবায়ুর গুণে কিছুটা ঠান্ডা হলে, আংশিক ভালোবেসে সাহিত্য-সংস্কৃতির অনুরাগী হলে; আবার বাঙালি স্বাধীনভাবে আত্মপ্রকাশের আকুলতা অনুভব করে। কিন্তু এই অল্প সময়ে সমাজের এত উন্নতি ঘটেনি যে, বাংলা ভাষায় মৌলিক সৃষ্টির দিগন্ত উন্মোচিত হতে পারে। তাছাড়া মুসলমানদের অতিমাত্রিক ধর্মানুরক্তির প্রভাব সমাজে এমন তরঙ্গ তুলেছিল, তাদের হৃদয়হীন আক্রমণে সমাজে এমন এক ক্ষয় ঘটেছিল যে, এই অব্যবস্থাযুক্ত ও অস্থিরচিত্ত সময়ে স্পষ্টতই প্রয়োজন ছিল জাতীয় সত্তার পুনরুভুত্থান। হিন্দু পুরাণ-মহাকাব্যের মধ্যে বাঙালি পেয়েছিল ধর্ম ও নীতির সুমহান আদর্শ। দ্বিধাহীনভাবে ‘প্রেরণা লাভ

করেছিল রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবত অনুবাদের। বিশেষ করে রামায়ণ ও মহাভারত অনুবাদের। এর কারণ প্রসঙ্গে 'প্রাচীন সাহিত্য' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, ''ভারতবর্ষের যাহা সাধনা, যাহা আরাধনা, যাহা সংকল্প তাহারই ইতিহাস এই দুই বিপুল কাব্যহর্ম্যের মধ্যে চিরকালের সিংহাসনে বিরাজমান।''

১.২। মধ্যযুগীয় বাংলা অনুবাদ সাহিত্য সৃষ্টির প্রেক্ষাপট

মধ্যযুগের বাংলাদেশে এক জটিল আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়েছিল। তখন বাঙালির হৃদয়ে এক বিচিত্র দ্বন্দ্বের ছবি ফুটে ওঠে। একদিকে বাঁচবার প্রেরণা অন্যদিকে প্রাণরক্ষার তাগিদ। মধ্যযুগে সাধারণ মানুষের সর্বাপেক্ষা বড় চাওয়া হল একটু সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে থাকা, নিরুপদ্রবে জীবন নির্বাহ করা ও ধর্মেকর্মে মন স্থির রাখা। এই ত্রিবিধ জীবনাচয়ণে যখন বিরোধ আসে, বাধা আসে, তখন সাধারণ মানুষের মনে দুশ্চিন্তার কালো মেঘ ঘনিয়ে আসে। আমরা যদি মধ্যযুগের বাংলাদেশের দিকে তাকাই, তবে এই মন্তব্যের যথার্থতা উপলব্ধি করতে পারব। বাঙালির এই যে মানসদ্বন্দ্ব, মধ্যযুগীয় বাংলা অনুবাদ সাহিত্যের প্রতি গভীর অভিনিবেশ সহকারে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেই তা স্পষ্ট হয়ে যায়। ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে আরম্ভ করে ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত আমরা মধ্যযুগে। একটি স্থূল কালসীমা নিরুপণ করতে পারি, যার আদিতে আছে সেন বংশের শাসনকালের শেষ সীমা এবং অন্যদিকে চৈতন্যদেবের যুগান্তকারী আবির্ভাব। মধ্যযুগের বাংলা অনুবাদ সাহিত্য থেকে বাঙালির হৃদয় চেতনার স্বরূপ নির্ণয়ের পূর্বে আমাদের যুগচেতনার প্রকৃত স্বরূপটি জেনে রাখা প্রয়োজন।

আমরা জানি, সাহিত্য হল সমাজের দর্পণ। তাই সাহিত্যের ঘাত-প্রতিঘাতের রহস্য জানতে হলে সমাজের গভীর তলদেশে প্রবেশ করতে হবে।

সেনবংশের রাজত্বকালে বাংলাদেশে একটি সুস্থ স্বাভাবিক জীবন গড়ে ওঠার অবকাশ পেয়েছিল। এই জীবনে প্রধানভাবে কার্যকরী হয়েছিল পৌরাণিক সংস্কার। পুরাণ-উপপুরাণের ঘটনা ও জীবনাদর্শ বাঙালি-সমাজে জনপ্রিয় হয়েছিল যদিও সমাজের সর্বত্র তা বিস্তারিত হয়নি। লক্ষ্মণসেনের সভাকে কেন্দ্র করে সংস্কৃত কাব্য সাহিত্যের যখন নূতন নূতন পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছিল, তখন তাতার-তুর্কী খোরাসানের মরু পর্বতবাসী ইসলাম ধর্মাবলম্বী একদল অশ্বারোহী বিদ্যুৎ গতিতে বাংলাদেশের কিয়দংশ অতর্কিতে অধিকার করে ফেলল। খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে পঞ্চদশ

মন্তব্য

শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত প্রায় দু'শ বছর ধরে এই অমানুষিক মুসলমান অভিযান বিস্তৃত ছিল। একে বঙ্গ সংস্কৃতির তামস যুগ (The dark age) বলা হয়। চৈতন্য আবির্ভাব ও হোসেন শাহী আমলের মাধ্যমে তামসিক মধ্যযুগে নবজীবনের আলোক-রেখা দেখা দিল। এই নবজীবনের আলোক-সাধনার ইতিহাসে তা তামসিক যুগে মধ্যেই নিহিত রয়েছে। মধ্যযুগের বাঙালি নানা জটিলতা, বহিরাক্রমণের বাত্যা-বিক্ষুব্ধতার মধ্যেও আলোর সাধনা করেছে। মধ্যযুগীয় অনুবাদ সাহিত্যের মধ্যে এই চর্চার ইতিকথা জানা যাবে। এই অনুবাদ সাহিত্য গড়ে উঠেছে সস্কৃতে রচিত রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবত গ্রন্থগুলি কেন্দ্র করে।

হৃদয়ধর্মকে খুঁজতে গেলে যুগচেতনার পাদমূলে গিয়ে দাঁড়াতে হবেই। এক কথায় হৃদয়ধর্ম ও যুগচেতনা একে অপরের পরিপূরক। মধ্যযুগ প্রধানতঃ বহিরাক্রমণের যুগ। এই আক্রমণে বাংলাদেশের গৃহজীবন বিপর্যস্ত। মানুষ তখন তার প্রাণ বাঁচাবার দুরূহ প্রচেষ্টায় ব্যাপৃত। তখন ধর্মেকর্মে মতি থাকা সম্ভব নয়। কিন্তু এইভাবে নিষ্ঠুর নিয়তির হাতে আত্মবিসর্জনও সম্ভব নয়। প্রত্যেক মানুষের অন্তরের একমাত্র কামনা ''মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে।'' তা শুধু কবির উক্তি নয়, ভূমিচারী অন্নজীবী মানুষেরও। কিন্তু মধ্যযুগের বাঙালির এমন কোন শক্তি ও সামর্থ্য ছিল না, যার দ্বারা তারা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে বহিরাক্রমণের প্রতিরোধ করে। তৎকালীন বাঙালি তার এই পরাভূত মনোভাব কাটিয়ে উঠবার জন্য বাঙালির চিত্তজগৎ আশা-আকাঙ্ক্ষার সোনার কিরণ সম্পাতে উজ্জ্বল করে তুলবার জন্য উচ্চ জীবনাদর্শ প্রচারের পরোক্ষ উপায় অবলম্বন করল। মধ্যযুগের অনুবাদ সাহিত্যের দিকে দৃষ্টিপাত করলেই তা স্পষ্ট হবে। এই অনুবাদ সাহিত্যের প্রধান কথা— (এক) গার্হস্থ্য জীবনের পুনঃপ্রতিষ্ঠা, (দুই) নির্বিবাদ শান্তির অভয় আশ্রয় প্রদান ও (তিন) ঈশ্বরের প্রতি একনিষ্ঠ ভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন। অনুবাদ সাহিত্যের আশ্রয়স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করতে গেলেই উপরিউক্ত বৈশিষ্ট্যগুলি জানা যাবে।

১.৩। অনুবাদ সাহিত্য সৃষ্টির সম্ভাব্য কারণ

খ্রিস্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দী থেকেই বাংলাদেশে অনুবাদ সাহিত্য জনপ্রিয়তালাভ করে। বিশেষ করে রামায়ণ ও মহাভারতের অনুবাদ মধ্যযুগীয় বাঙালি জীবনকে নতুনভাবে ও আদর্শে গড়ে তুলেছে।

দ্বিতীয়ত, ইসলামের অভিযান হিন্দু সমাজকে আতঙ্কিত করলেও ইসলামরা

বাংলাদেশের ভাষা ও সংস্কৃতিকে ভালোবাসতেন এবং এদেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রতি কৌতূহলী ছিলেন। পঞ্চদশ শতকে রামায়ণ-মহাভারত ইত্যাদির অনুশীলন যে বাংলাদেশে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে প্রীতির বন্ধন দৃঢ় করেছিল, তাতে সন্দেহ নেই। মন্তব্য

তৃতীয়ত, একথা সত্য যে, বাংলায় আর্য সংস্কারের প্রভাব অনুবাদ সাহিত্যের মারফতেই জনসমাজে অনুপ্রবেশ করেছে, তা না হলে বাংলা সাহিত্য কোনদিন লোকসাহিত্যের সীমা ছাড়াতে পারত না। এছাড়া ভক্তিপ্রবণ বাঙালিকে স্বভাবতই অনুবাদ সাহিত্য রচনায় উদ্বুদ্ধ করেছিল। সুতরাং বাঙালি সমাজে পুনর্গঠনের জন্য বাঙালি ঐতিহ্যের সর্বভারতীয় প্রাণধারার সঙ্গে যোগস্থাপনের প্রয়াসে স্বল্পশিক্ষিত ও অশিক্ষিতদের সঙ্গে পৌরাণিক ঐতিহ্য ও ভাবাদর্শের মিলনের প্রয়োজনে এবং বাংলার সংস্কৃতি ও সাহিত্যের পূর্ণ পরিণতির কারণে মধ্যযুগে অনুবাদ সাহিত্য রচনার প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল।

চতুর্থত, দুশো বৎসর ব্যাপী পাঠান শাসনে বাংলা হিন্দু সমাজের যে ভাঙন ধরেছিল তাকে গড়ে তুলতে হলে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির মূলকেন্দ্র রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবতের আদর্শ, নীতি, তত্ত্ব ও কাহিনীর পুনঃপ্রচারের আবশ্যকতা সেদিন উপলব্ধ হয়েছিল। হিন্দু সমাজের সব শ্রেণির মধ্যে নিজ নিজ ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রতি আস্থা ফিরিয়ে আনতে হলে পৌরাণিক সাহিত্য বিশেষ করে রামায়ণ, মহাভারতের প্রচারের প্রয়োজন ছিল। তাই অনুবাদকগণ রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবতের মারফতে পৌরাণিক সাহিত্যের মূল নির্যাস প্রচারে ব্রতী হয়েছিলেন।

১.৪। আত্মমূল্যায়নধর্মী প্রশ্ন

১। অনুবাদ সাহিত্য সৃষ্টির সম্ভাব্য কারণগুলি উল্লেখ কর।

২। বঙ্গসংস্কৃতির তামসযুগ কাকে বলে?

৩। মধ্যযুগীয় অনুবাদ সাহিত্যের প্রধান বিষয়গুলি কি কি?

১.৫। সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

১। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত - অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

২। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস - দেবেশ আচার্য।

৩। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস - ড. ক্ষেত্র গুপ্ত।

৪। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস - শ্রীমন্ত কুমার জানা।

একক-২ কৃত্তিবাসী রামায়ণের কবি পরিচয়, কৃত্তিবাস সমস্যা, বাল্মীকি ও কৃত্তিবাসী রামায়ণের তুলনা, সংস্কৃত রামায়ণের গুরুত্ব।

বিন্যাসক্রম

২.১। কবি পরিচয়

২.২। কৃত্তিবাস সমস্যা

২.৩। বাল্মীকি রামায়ণ ও কৃত্তিবাসী রামায়ণের তুলনা

২.৪। সংস্কৃত রামায়ণের গুরুত্ব

২.৫। আত্মমূল্যায়নধর্মী প্রশ্ন

২.৬। সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

২.১। কবি পরিচয়

কৃত্তিবাসী রামায়ণ বিগত পাঁচশো বছর ধরে সারা বাংলার ঘরে ঘরে গীত ও পঠিত হয়ে আসছে। রাজমহল থেকে চট্টগ্রাম এবং উড়িষ্যার উপকূল থেকে কামরূপ পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চল যে কাব্যের রসধারায় প্লাবিত, দুঃখের বিষয় তার রচয়িতা সম্পর্কে নিশ্চিত করে বলার মতো যথেষ্ট তথ্য প্রমাণ আমাদের হাতে নেই। জাতীয় কবি সম্পর্কে আমাদের এই উদাসীনতাই প্রমাণ করে যে আমরা সত্যিই আত্মবিস্মৃত জাতি। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যেও এই পূর্বসূরীর কোনো উল্লেখ পাইনা। একমাত্র জয়ানন্দ তাঁর চৈতন্যমঙ্গলে কৃত্তিবাসকে স্মরণ করেছেন।—

‘রামায়ণ করিল বাল্মীকি মহাকবি।
পাঁচালী করিল কৃত্তিবাস অনুভবি।।’

তারপর ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত কোনো বাঙালী কৃত্তিবাসের ব্যক্তিপরিচয় জানতে উৎসুক হয়নি। শ্রীরামপুরে প্রকাশিত কৃত্তিবাসী রামায়ণের প্রথম সংস্করণ (১৮০২-০৩) বা জয়গোপাল তর্কালংকার সংশোধিত দ্বিতীয় সংস্করণেও (১৮৩০) কৃত্তিবাসের জীবন সম্বন্ধে কোনও জ্ঞাতব্য তথ্য পাওয়া যায়নি।

প্রথম ছাপার অক্ষরে কৃত্তিবাস পরিচয় দেখা যায় হরিশচন্দ্র মিত্রের ‘কৃত্তিবাসের পরিচয় সংগ্রহ’ নামক পুস্তিকায় (১৮৭০)। সম্ভবতঃ কুলজী গ্রন্থের সঙ্গে মিল রেখে কোনো রামায়ণ গায়ক বা কথক এই আত্মপরিচয়-জ্ঞাপক বিবরণীটি রচনা করেছিলেন।

তার কিছু পংক্তি এরকম— মন্তব্য

‘মুরারি নামেতে ওঝা ছিলেন কাশীবাসী।
করিলেন বসবাস ফুলিয়াতে আসি।।
হইলেন তাঁহার পুত্র বনমালী নাম।
রামভক্ত অনুরক্ত নানা গুণধাম।।
বাপ বনমালী ওঝা মান্‌কি উদরে।
জন্মিলেন কৃত্তিবাস চারি সহোদরে।।
কৃত্তিবাস পণ্ডিতে জন্ম শুভক্ষণ।
ভাষা করি রচিলেন গ্রন্থ রামায়ণ।।
পরম আদরে বন্দি তাঁহার চরণ।
গাইব রচিলা যেমন রামায়ণ।।’

১৩০১ সালের সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় হীরেন্দ্রনাথ দত্ত কৃত্তিবাসের বিভিন্ন পুথি ও মুদ্রিত রামায়ণ নিয়ে বিশদ আলোচনা করেন। তবে কৃত্তিবাসের ব্যক্তিপরিচয় সম্পর্কে কোনো তথ্য তিনি দিতে পারেননি। অবশ্য তখন থেকেই এ বিষয়ে মানুষের সচেতনতার সৃষ্টি হয় এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের উদ্যোগে ‘কৃত্তিবাসী রামায়ণ সমিতি’ গঠিত হয় (১৩০২)। তাতে যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্‌বল্লভ নলিনীকান্ত ভট্টশালী প্রমুখ পণ্ডিতেরা গবেষণা করে অনেক নতুন তথ্য উদ্ধার করলেও কৃত্তিবাস সমস্যার সমাধানসূত্র পাওয়া যায়নি। পণ্ডিতদের সংগৃহীত তথ্যের মধ্যে অনেক অসংগতি আছে। তাঁদের কারো সঙ্গে কারো মতের মিল হয়নি। ১৩০৪ সালে নগেন্দ্রনাথ বসু ‘বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস’ গ্রন্থের বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ কাণ্ডে সর্বপ্রথম কৃত্তিবাসের আত্মপরিচয়— শীর্ষক পয়ারের প্রথম ন'টি ছত্র উদ্ধৃত করেন। তাঁর পরে দীনেশচন্দ্র সেনের ‘বঙ্গভাষা ও সাহিত্য’ গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণে (১৯০১) কৃত্তিবাসের একটি ১৫২ ছত্রের পূর্ণাঙ্গ আত্মবিবরণী প্রকাশিত হয়।

হুগলী জেলার বদনগঞ্জ নিবাসী হারাধন দত্ত ভক্তিনিধি এক বৃদ্ধ কথকের কাছে রামায়ণের অনেকগুলি পুঁথি পান। তারই একটি পুথিতে (১৫০১ খ্রীঃ অনুলিখিত) ভক্তনিধি মশায় কৃত্তিবাসের আত্মবিবরণ-সংক্রান্ত পয়ারগুলি পান। কলকাতা

মন্তব্য

বিশ্ববিদ্যালয়ের দীনেশচন্দ্র এই খবর পেয়ে ভক্তনিধির সঙ্গে যোগাযোগ করেন। তখন ভক্তনিধি ওই আত্মপরিচয়-জ্ঞাপক পয়ারগুলি নকল করে তাঁকে পাঠান। নগেন্দ্র বসুও হয়তো এইভাবে নকল আকারেই পয়ারগুলি পেয়েছিলেন, তবে তিনি তার কোনো উৎস উল্লেখ করেননি। ভক্তনিধি মূল পুথি কাউকেই দেখাননি। এরপরে ১৩১৮ সালের সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় যোগেশচন্দ্র রায় জানালেন যে হারাধন ভক্তনিধি তাঁর রক্ষিত সমস্ত পুঁথি স্থানীয় নগেন্দ্রবালা মুস্তফীকে বিক্রি করে দেন। অবশ্য হারাধন দত্তের কাছে পুঁথিগুলির নকল ছিল। ইতিমধ্যে ১৩১৩ সালে নগেন্দ্রবালা আত্মহত্যা করায় এবং পরে ভক্তনিধির মৃত্যু হওয়ায় মূল বা নকল কোনো পুঁথিরই আর হদিশ পাওয়া যায়নি। তবে ড. নলিনীকান্ত ভট্টশালী ঢাকা ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে রাখা চারটি পুঁথির সাহায্যে প্রমাণ করেছেন যে ওই আত্মবিবরণী জাল বা মিথ্যা নয়।

এর কিছুদিন পরে ডঃ ভট্টশালী নগেন্দ্র বসুর কাছে রক্ষিত কুলজী পুঁথিগুলি কিনে আনার জন্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালার অধ্যক্ষ ড. সুবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে পাঠান। সুবোধচন্দ্র পুঁথিগুলি দেখেছিলেন এবং আদিকাণ্ডের একটি পুঁথির প্রথম তিনটি পৃষ্ঠা পেয়েছিলেন যা নাকি প্রচলিত আত্মবিবরণীর হুবহু অনুরূপ। কিন্তু বসু মশায় পুঁথিগুলি বিক্রি করতে এমনকি নকল করতে দিতেও রাজি হননি। যা হোক নগেন বসুর মৃত্যুর পর ১৩৪০ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁর উত্তরাধিকারীর কাছ থেকে পুঁথিগুলি কিনে নেন। তখন আদিকাণ্ডের ওই প্রথম তিন পৃষ্ঠা ড. ভট্টাশালীর হাতে আসে এবং তিনি সন্ধান পান যে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পুথিশালায় রাখা ১৫ সংখ্যক খণ্ডিত পুঁথিটিই সম্ভবতঃ ওই তিন পৃষ্ঠার পরবর্তী অংশ। কেননা এই পুঁথির পাতা, আকার ও লেখা ওই তিন পৃষ্ঠার সঙ্গে অবিকল মিলে যায়। তাছাড়া ওই তিন পৃষ্ঠার সব শেষের পংক্তিটি হল— 'নারদ বলে গোসাঞি শুন মোর বানী'। আর সাহিত্য পরিষদের পুঁথি শুরু হচ্ছে যে পংক্তিটি দিয়ে তা হল — 'অত্রিক মুনির পুত্র আছে চ্যবন নামে মুনি।।' বোঝা যাচ্ছে পংক্তি দুটি একই শ্লোকের দুই চরণ এবং সাহিত্য পরিষদের পুঁথিটি আগের তিন পৃষ্ঠার পরবর্তী চতুর্থ পৃষ্ঠা। আবার সাহিত্য পরিষদের পুঁথির বিবরণীতে আছে যে এটি হুগলী জেলা থেকে সংগৃহীত এবং পুঁথির পুষ্পিকায় আছে এটি বদনগঞ্জে লেখা হয়েছিল। সুতরাং এই পুঁথিই বদনঞ্জের হারাধন দত্তের

কাছে ছিল এ অনুমান অসংগত নয়। তবে পুঁথিটি এমন ভাবে খণ্ডিত হল কি করে এবং প্রথম তিনপৃষ্ঠা নগেন বসুর কাছে এবং অবশিষ্টাংশ সাহিত্য পরিষদে এলো কিভাবে তার কোনো সদুত্তর পাওয়া যায় না।

দীনেশচন্দ্র সেনের মুদ্রিত আত্মবিবরণে ১৫২টি ছত্র এবং ভট্টশালী সংগৃহীত (নগেন্দ্র বসুর হেফাজতে রক্ষিত) পুঁথিতে ১৮২ ছত্র পাওয়া যায়। দুই পুঁথিতে ৫০টি ছত্র হুবহু এক। বাকি পংক্তিগুলিতে মিল অল্প, কোথাও নতুন শব্দ, কোথাও বা নতুন পংক্তি যোজনা করা হয়েছে। সুতরাং বাধ্য হয়ে অনুমান করতে হয় যে হারাধন দত্ত যখন দীনেশচন্দ্রকে আত্মবিবরণীটি নকল করে পাঠান তখন এইরকম অজস্র পরিবর্তন ঘটিয়েছিলেন। এই দুটি ছাড়া ঢাকা ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বা সাহিত্য পরিষদে রক্ষিত পুঁথি চারটিতে কৃত্তিবাসের পরিচয় অতি সংক্ষিপ্ত, আট থেকে বারো ছত্রের বেশি নয়। এগুলিতে শুধু ফুলিয়া গ্রাম, কৃত্তিবাসের পিতামহ মুরারি ওঝা, পিতা বনমালী, মাতা মেনকা (মানিকি, মালীকা বা মালিনী), ছয় সহোদর, বড়গঙ্গা পারে বিদ্যাভ্যাসের জন্য যাত্রা এই তথ্যটুকু পাওয়া গেছে। এবার দীনেশচন্দ্রের গ্রন্থে বা ভট্টশালীর পুঁথিতে পাওয়া বিবরণটি দেওয়া হল ঃ-

কৃত্তিবাসের পূর্বপুরুষ পূর্ববঙ্গবাসী নারসিংহ ওঝা বেদানুজ রাজার পাত্র ছিলেন। ওই অঞ্চলে ‘প্রমাদ’ (সম্ভবতঃ মুসলমান অধিকার) হলে ওঝা নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে পশ্চিমবঙ্গের গঙ্গাতীরে ফুলিয়া গ্রামে আসেন। ওই গ্রামে ফুলবাগান করে মালীরা বাস করত বলে গ্রামের নাম হয়েছিল ফুলিয়া। তাঁর বংশধর মুরারি ওঝার পুত্র বনমালী। এই বনমালী এবং তাঁর স্ত্রী মালিনীর ছয় পুত্র ও তার কন্যা। কৃত্তিবাস জ্যেষ্ঠ পুত্র। তিনি মাঘ মাসের রবিবার শ্রীপঞ্চমী তিথিতে জন্মলাভ করেন এবং বারো বছর বয়সে বড় গঙ্গা পার হয়ে উত্তরদেশে বিদ্যালাভের জন্য যাত্রা করেন। আত্মবিবরণীর ভাষায় ‘হেনকালে পড়িতে গেলাম উত্তর দেশ’ এবং ‘পাঠের নিমিত্ত গেলাম বড় গঙ্গা পার’। এই প্রসঙ্গে হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় বলেছেন— কৃত্তিবাস নবদ্বীপে বা তন্নিকটবর্তী কোনও স্থানে পাঠাভ্যাস করিতে যান’ (রামায়ণ, সাহিত্য সংসদ, ১৯৮৩, ভূমিকা পৃ. ২৭)। তাঁর যুক্তি হ’ল ফুলিয়া গ্রাম থেকে নবদ্বীপ নিশ্চিত ‘উত্তরদেশ’ এবং পদব্রজে গেলে তার দূরত্ব যথেষ্ট। তাছাড়া ফুলিয়ার আশপাশে নিশ্চয় গঙ্গার শাখানদী বা খাল ছিল। তাই ‘বড়গঙ্গা’ বলতে নবদ্বীপের নিম্নবাহিনী ভাগীরথীকেই বোঝানো হয়েছে ভাবা

মন্তব্য

যেতে পারে। তার তখন গঙ্গার বিশালত ও গভীরতা যথেষ্ট ছিল। তবে অন্যেরা অনেকেই 'বড়গঙ্গা পারে' বলতে পদ্মাপার বা যশোহর বুঝেছেন। এ বিষয়ে হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের ধারণা নবদ্বীপ বহুকাল থেকেই পণ্ডিতপ্রধান স্থান। সেখান ছেড়ে কবি বিদ্যালাভের জন্য কেন পদ্মাপার যাবেন- বিশেষতঃ বারো বছর বয়সে!

যাই হোক, দশ বারো বছর অধ্যায়ন করে তরুণ কবি দেশে ফিরে আসেন এবং গৌড়েশ্বরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যান। তিনি সাতটি স্বরচিত শ্লোক গৌড়েশ্বরের কাছে পাঠালে রাজা তাঁকে ডেকে পাঠান। তিনি ন'টি সুসজ্জিত মহল পার হয়ে পাত্রমিত্র পরিবৃত রাজার কাছে পৌঁছলেন। তখন আঙিনায় 'রাঙা মাজুরি' পাতা হয়েছে যার চারদিকে সূক্ষ্ম পট্টবস্ত্রের বেষ্টনী, মাথার ওপর পাটের চাঁদোয়া। মাঘ মাসের সকালে সভাসদসহ রাজা ওই মাজুরিতে বসে 'খরা' অর্থাৎ রোদ পোয়াচ্ছিলেন। রাজার ইঙ্গিতে কবি তাঁকে স্বরচিত শ্লোকগুলি শোনালেন। শুনে রাজা খুশী হয়ে তাঁকে ফুলের মালা এবং একটি পাটের পাছড়া দান করলেন এবং কবির কি প্রার্থনা তা জানতে চাইলেন। কিন্তু নির্লোভ ব্রাহ্মণ কবি 'গৌরব' ছাড়া আর কিছুই চাইলেন না। তারপর তাঁর পাণ্ডিত্যের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল এবং শেষে গুরু ও বাবা-মা'র আশীর্বাদে তিনি রামায়ণ পাঁচালী রচনা করলেন।

এই অসম্পূর্ণ বিবরণী থেকে তাঁর জন্ম সাল বা কোন গৌড়েশ্বরের সভায় তিনি গিয়েছিলেন তা কিছুই জানা যায় না। যাই হোক, বহু গবেষণার পর নানা পরোক্ষ প্রমাণের ভিত্তিতে সম্ভবত ১৩৯৮ খ্রীষ্টাব্দই কৃত্তিবাসের জন্ম সাল বলে পণ্ডিতেরা অনুমান করেছেন। আর যে গৌড়েশ্বরেরর সভায় তিনি সম্মানিত হয়েছিলেন তিনি সম্ভবত হিন্দু রাজা গণেশ। কোনো গবেষক তাঁকে দনুজমর্দন দেব, কেউ তাঁকে কংসনারায়ণ আর কেউ বা (সুখময় মুখোপাধ্যায়) তাঁকে রুক্নুদ্দীন বারবক শাহ বলে মনে করছেন। তবে এ সম্বন্ধে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছবার মতো যথেষ্ট প্রমাণের অভাব আজও রয়েছে। তবু তিনি কতদিন জীবিত ছিলেন তাও পরোক্ষ প্রমাণের সাহায্যে অনুমান করা গেছে। সম্ভবতঃ তিনি ৭০-৮০ বছর জীবিত ছিলেন।

কৃত্তিবাসের আত্মবিবরণ কৃত্তিবাসের নিজের রচনা না গায়ক-কথকের রচনা না

সম্পূর্ণ কাল্পনিক, সে নিয়েও মতভেদ আছে। এই আত্মবিবরণে কৃত্তিবাসের নিজের প্রশংসা এত বেশি আছে যে স্বয়ং কবির রচনা বলে মনে হয় না। রামায়ণ পুঁথির আরম্ভে যদি কোনো গায়েন কৃত্তিবাসের এই বংশপরিচয় সংযোজন করে থাকেন তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। তবু সব পুঁথিতেই কৃত্তিবাসের বংশপরিচয়ের কোনো হেরফের হয় না। তাই এটির রচয়িতা সম্পর্কে নিঃসংশয় হওয়া না গেলেও আত্মবিবরণীটি যে অলীক নয় তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। মন্তব্য

২.২। কৃত্তিবাস সমস্যা

কৃত্তিবাসের আত্মবিবরণীটি কবির পরিচয় পরিবেশন করলেও, কবির আবির্ভাবকাল নির্ণয়ে যথেষ্ট সমস্যা ঘনিয়ে তুলেছে। এর কারণ কবি রচিত দুই পংক্তির পয়ার শ্লোক—

আদিত্যবার শ্রীপঞ্চমী পুণ্য মাঘ মাস।
তথি মধ্যে জন্ম লইলাম কৃত্তিবাস।।

'পুণ্য' মাঘ মাসের বিচার ধরলে, রবিবার, শ্রীপঞ্চমী তিথি অর্থাৎ সরস্বতী পূজার দিন কবির জন্ম। কিন্তু হারাধন দত্ত ভক্তনিধি প্রদত্ত এবং ডঃ দীনেশচন্দ্র সেনের প্রকাশিত বিবরণীতে 'পুণ্য' শব্দের বদলে পাঠ ছিল 'পূর্ণ'। এই 'পূর্ণ' শব্দের বিচারে অগ্রসর হলে দেখা যায়, রবিবার শ্রী পঞ্চমী তিথিতে মাঘমাসের শেষ দিনে অর্থাৎ মাঘীসংক্রান্তিতে কবির জন্মসময় নির্দ্ধারিত হয়। জোতিষশাস্ত্র বিচার করে অর্থাৎ 'পূর্ণ মাঘ মাস' ধরে গণনা করে যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি জানালেন, ১৩৫৪ শকের (১৪৩২-৩৩ খ্রীঃ) ২৯শে মাঘ (মাঘী সংক্রান্তি) শ্রীপঞ্চমী তিথিতে কৃত্তিবাসের জন্ম হয়। কিন্তু আত্মবিরণরীর অন্যান্য অংশ অবলম্বনে এই গণনা যথার্থ বলে প্রতিষ্ঠিত হয় না। কেননা, কৃত্তিবাস বর্ণিত গৌড়েশ্বরের পরিবেশ এবং কবি বর্ণিত পাত্রমিত্রদের পদবি দেখে অনুমান হয়, কবি হিন্দু রাজা গণেশের (১৪১৪-১৪১৮) রাজসভাতেই গিয়েছিলেন। সুতরাং কৃত্তিবাস-এর আগেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন। পরে আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি 'পুণ্য' শব্দের অর্থ ধরে গণনা করে জানালেন, ১৩২০ শকের (১৩৯৮-৯৯খ্রীঃ) ১৬ই মাঘ রবিবার ছিল শ্রীপঞ্চমী তিথি। এই সময়ে কৃত্তিবাসের জন্ম হলে রাজা গণেশের রাজসভায় (১৪১৪-১৮ খ্রীঃ) যাওয়া সম্ভব। ষোল থেকে কুড়ি বছর বয়স হলেও প্রতিভাধর কৃত্তিবাসের পক্ষে ঐ বয়সে কৃতিত্ব অর্জন করা অযৌক্তিক নয়।

মন্তব্য

১৩৯৮-৯৯ খ্রীষ্টাব্দে কৃত্তিবাসের আবির্ভাবকাল সম্পর্কে নিঃসংশয় মত না দিয়ে বরং বিরোধী মত উত্থাপন করলেন বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ পণ্ডিতগণ। এঁরা আবার 'পূর্ণ মাঘ মাসে'র বিচারে ১৩৫৪ শক (১৪৩২-৩৩ খ্রীঃ)। কৃত্তিবাসের জন্মকাল বলে অভিমত পোষণ করেন। এই সব পণ্ডিতদের মতে, কৃত্তিবাস তাহিরপুরের হিন্দু রাজা কংসনারায়ণের পৃষ্ঠপোষকতায় রামায়ণ রচনা করেছিলেন। ড: ভট্টাশালী এই অভিমতের অসংগঠিত প্রদর্শন করেন। প্রধানত দুস্থপঞ্জীর সহায়তায় তিনি প্রতিপন্ন করেন যে রাজত্বকাল ছিল আনুমানিক ষোড়শ শতকের মধ্যভাগ। পঞ্চদশ শতকের প্রথমার্ধে (১৪৩২-৩৩ খ্রীঃ) জাত কবির পক্ষে ষেড়াড়শ শতকের মধ্যভাগে কোনো রাজসভায় উপস্থিত হওয়া সম্ভব নয়। বসন্তরঞ্জন রায় বা অপর কোনো প্রতিপক্ষীয় বিশেষজ্ঞ ড. নলিনীকান্তের এই আপত্তি খণ্ডন করেননি" (বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা ঃ ১মা পর্যায়, শ্রী ভূদেব চৌধুরী)। অধ্যাপক মনীন্দ্রমোহন বসু আবার কৃত্তিবাসের গ্রন্থ রচনার কাল পঞ্চদশ শতকের শেষভাগ বলে অনুমান করেছিলেন। অধ্যাপকের অভিমত কৃত্তিবাসের পূর্বপুরুষ নরসিংহ ওঝা ১৪১৭-১৮ সালে চট্টগ্রামের অধিপতি জনৈক দনু জমিদারির রাজসভায় পাত্র রূপে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাই কৃত্তিবাসের পক্ষে রাজা গণেশ বা কংসনারায়ণ কারো রাজসভাতেই উপস্থিত হওয়া সম্ভব নয়। কবি কৃত্তিবাসের পৃষ্ঠপোষক 'গৌড়েশ্বর' 'রাজা'-উপাধিধারী কোন জমিদার হওয়াই সম্ভব। অধ্যাপক বসু কৃত্তিবাসের আত্মবিবরণীকে স্বাভাবিক ও সঙ্গতিপূর্ণ বলে মনে করেননি। তবে অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায় ও ডঃ সুকুমার সেন এই পর্যায়ে মোটামুটি মত দিয়েছেন যে, কৃত্তিবাসের আবির্ভাব পঞ্চদশ শতকের শেষে হাওয়াটাই মোটামুটি সঙ্গত।

কৃত্তিবাসের আবির্ভাব প্রসঙ্গে অপর দুটি বিচারের উপাদান-কুলজীগ্রন্থ এবং গৌড়েশ্বর। কৃত্তিবাস গৌড়নৃপতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন প্রসঙ্গে বলেছেন—

পঞ্চগৌড় চাপিয়া গৌড়েশ্বর রাজা।
গৌড়ের পূজা কৈলে গুণের হয় পূজা।।

এই গুণবান গৌড়েশ্বরের এগারো জন পার্শ্বচরের নামের উল্লেখ কৃত্তিবাস দিয়েছেন, কিন্তু আসল গৌড়েশ্বরের নামটিই বাদ পড়ে গেছে। সেই এগারোজন পার্ষদ হলেন— জগতানন্দ, সুনন্দ, কেদার খাঁ, নারায়ণ গন্ধর্বরায়, কেদার রায়, তরণী, সুন্দর, শ্রীবৎস,

মুকুন্দ, জগদানন্দ রায়। কবির বিবরণে মনে হয় গৌড়েশ্বর জনৈক হিন্দু রাজা। কয়েকজন মুসলমান উপাধিক পার্শ্বচর হলেও বেশীরভাগই হিন্দু পর্ষদ, চন্দন, মাল্য, পট্টবস্ত্রের উপহারও হিন্দুরীতি সম্মত। এই হিন্দুরাজা আর কেউ নন, রাজা গণেশ। জ্যোতিষ হিসাবে, কুলজীগ্রন্থের বিচারের সঙ্গেও তাতে অসঙ্গতি ঘটে না। অন্যদিকে, ইতিহাস অনুসরণ করলে লক্ষ্য করা যায়— ইলিয়াস শাহি রাজাদের কাল থেকে হুসেনশাহি বংশের শাসন আমল পর্যন্ত মুসলমান গৌড়াধিপতিদের রাজসভা অলঙ্কৃত করে থাকতেন হিন্দু পার্ষদগণ। সুতরাং কৃত্তিবাসের উল্লিখিত গৌড়েশ্বর মুসলমান হওয়াটা অসঙ্গত নয়। এই মুসলমান সম্রাট হলেন রুকনুন্দিন বারবক শাহ (১৪৫৯-১৪৭৪ খ্রীঃ)। পার্ষদ কেদার রায়ের ঐ রাজসভাতে উপস্থিতি, গন্ধর্ব রায়ের ও বারবক শাহের রাজসভাতে উপস্থিতির অনুমান এবং আরো দু-একজন পর্ষদের নাম বারবক শাহের রাজসভার সঙ্গে যুক্ত হওয়ায় কৃত্তিবাস কথিত গৌড়েশ্বর বারবক শাহ হওয়াটাই অনেকে সঙ্গতবলে বিবেচনা করেন। এই সূত্রে অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায় এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, কৃত্তিবাস পঞ্চদশ শতকের কোন এক সময় জন্মগ্রহণ করেন। এই সময়টা পঞ্চদশ শতকের প্রথমার্দ্ধ হওয়াটাই স্বাভাবিক।

মন্তব্য

কৃত্তিবাসের আবির্ভাবকাল নির্ণয়ে শেষ বিচার কুলজী গ্রন্থের সাক্ষ্যপ্রমাণ। কুলজীগ্রন্থে কুলীনদের বংশতালিকা থাকে। এর সাহায্যে ডঃ দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য বিভিন্ন কুলজীগ্রন্থের সাক্ষ্যাদি বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্ত করেন— ১৪১০ খ্রীষ্টাব্দের পরে কৃত্তিবাসের জন্ম সম্ভব নয়। তিনি অনুমান করেন, ১৩৮৯ খ্রীষ্টাব্দে কৃত্তিবাসের জন্মসাল এটা ধরে নেওয়া যায়। তাছাড়া কৃত্তিবাসের তিন পত্নীর একজনের পিতার নাম ছিল শংকর। এই শংকর আবার বিখ্যাত নৈয়ায়িক কণাদ তর্কবাগীশের বৃদ্ধপ্রপিতামহ উৎসাহের ভ্রাতা। অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় এই তথ্য থেকে অনুমান করেন, কৃত্তিবাস কণাদ তর্কবাগীশের প্রপিতামহের সমকালীন। শেষপর্যন্ত সিদ্ধান্ত করা যায় কণাদ তর্কবাগীশের জীবৎকাল থেকে অনুমান করে কৃত্তিবাসের জীবৎকাল পঞ্চদশ শতকের ''সপ্তম, অষ্টম বা নবম দশক''-এর কোন একটি বলে প্রতিষ্ঠিত করা যেতে পারে।

২.৩। বাল্মীকি রামায়ণ ও কৃত্তিবাসী রামায়ণের তুলনা

'যাবৎ স্থাস্যন্তি গিরয়ঃ সরিতশ্চ মহীতলে।

তাবদ্ রামায়ণকথা লোকেষু প্রচরিষ্যাতি।।' আদিকাণ্ড ২।৩৬

মন্তব্য

অর্থাৎ যতকাল ভূতলে গিরিনদী সকল অবস্থান করবে ততকাল রামায়ণী কথা লোকসমাজে প্রচারিত থাকবে। রামায়ণকার বাল্মীকির প্রতি ব্রহ্মার এই আশীর্বাণী যে কতদূর সত্য বিগত আড়াই হাজার বছর ধরে ভারতবর্ষ তা প্রত্যক্ষ করে আসছে। আর আজ পর্যন্ত রামায়ণের গুরুত্ব ও উপযোগিতা যে নিঃশেষ হয়ে যায়নি, রামায়ণ অবলম্বনে রচিত একালের সাহিত্য ও রামায়ণ-সম্পর্কিত আলোচনাগুলি তার প্রমাণ।

ভারতীয় সভ্যতার সঙ্গে রামায়ণের নাড়ির যোগ, কেননা এদেশের মাটিতেই এ কাব্যের জন্ম।তাই রামায়াণে ভারতের ভারততত্ত্ব প্রকাশিত একথা বলা চলে। অর্থাৎ ভারতের সংস্কৃতি প্রায় সর্বাঙ্গীণ ও সুসমঞ্জস রূপে এ কাব্যে প্রতিফলিত হয়েছে, ভাব-ভারতের আত্মা এতে ধরা দিয়েছে, তার সাধনা, তার আরাধনা, তার সংকল্প এতে রূপলাভ করেছে। তবে রামায়ণ ভারতবর্ষকে শুধু প্রকাশ করেনি তাকে প্রভাবিতও করেছে। ভারতবর্ষের জাতীয় চরিত্রগঠনে রামায়াণের ভূমিকা প্রত্যক্ষ। বস্তুতঃ ভারতবর্ষের ব্যক্তিজীবন, গার্হস্থ্যজীবন, সামাজিক জীবন, এমনকি রাষ্ট্রীয় জীবনের ধারাও রামায়ণ তথা রামচরিত্রের আদর্শেই পরিচালিত ও গভীরভাবে নিয়ন্ত্রিত হ'ত। আসলে মনুসংহিতা প্রভৃতি ভারতীয় ধর্মশাস্ত্রগুলি বিধিবদ্ধ হওয়ার পর সেই শাস্ত্রনির্দিষ্ট নীতিতেই ভারতের জাতীয় জীবন নিয়ন্ত্রিত হতে থাকে। তাই ওই যুগে যে রাম কাহিনী পরিকল্পিত হ'ল তাতে শাস্ত্রনির্দিষ্ট নীতিকেই মেনে নেওয়া হল এবং রামচরিত্রে সেই নীতিই বাস্তব দৃষ্টান্ত রূপে প্রতিষ্ঠিত হল। রামায়াণের উত্তরকাণ্ডটি তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। অবশ্য 'উত্তরকাণ্ড' নামটিই জানিয়ে দেয় যে এটি পরবর্তীকালের সংযোজন।

রামকথার আদি উৎস খুঁজতে গেলে দেখি, প্রাচীন ভারতবিদ্যার আধুনিক রীতির আলোচকদের মতে অন্ততঃ অড়াই হাজার বছর আগে ভারতে আর্যভাষায় রামায়ণ-কথা তার প্রথম রূপ গ্রহণ করে। রামায়ণ-রচনার পূর্ব-ইতিহাস বিবৃত করে রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন—

> ''রামায়ণ রচিত হইবার পূর্বে দেশে রামচন্দ্র সম্বন্ধে...একটা লোকশ্রুতি নিঃসন্দেহেই প্রচলিত ছিল।..। রামচরিত সম্বন্ধে যে-সমস্ত আদিম পুরাণ কথা দেশের জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত ছিল, এখন তাহাদিগকে আর খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। কিন্তু তাহাদেরই মধ্যে রামায়ণের একটা পূর্বসূচনা দেশময় ছড়াইয়া ছিল, তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই।''

— ‘সাহিত্য’, সাহিত্যসৃষ্টি ১৯০৭ মন্তব্য

ভারতবর্ষের মধ্যেই নানা মৌখিক ও সাহিত্যিক রূপভেদকে আশ্রয় করে এই রামকাহিনী পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত হয়। ভারতের বিভিন্ন কথ্যভাষায় প্রচলিত মৌখিক রূপগুলির বিলোপ না ঘটিয়ে সেগুলিকে গ্রহণ বর্জনের মধ্যে দিয়ে সংস্কার ও সংকলন করে মহর্ষি বাল্মীকির নামের সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়া হয়েছিল। সুতরাং এ কথা মানতে হয় যে রামায়ণই যুগে যুগে ভারতীয় চিন্তা ও চরিত্রকে রূপায়িত ও নিয়ন্ত্রিত করেছে তা নয়, ভারতীয় চিত্তও কালে কালে নিজের প্রয়োজন মতো রামায়াণকে নতুন করে গড়ে নিয়েছে। বাল্মীকির নামে প্রচারিত যৌগবাশিষ্ঠ রামায়ণ, অদ্ভুত রামায়ণ কিংবা ব্যাসদেবের নামে প্রচলিত অধ্যাত্ম রামায়ণ এই প্রয়োজনেরই সৃষ্টি। এইভাবে রামায়াণের সঙ্গে ভারতবর্ষের চিত্তগত ঘনিষ্ঠতা ক্রমশঃ নিবিড় হয়েছে আর রামকাহিনীর এই ক্রমবিবর্তনের মধ্যে রয়ে গেছে ভারতবর্ষের অন্তরের যথার্থ ইতিহাস। বলা বাহুল্য এ ইতিহাস তথ্যগত নয়, এ ভারতীয় জনমানসের অন্তর্লীন সত্যগত ইতিহাস। নিছক তথ্যগত হলে রামায়াণের প্রভাব কখনও এমন গভীর হতে পারত না। কেননা তথ্য হচ্ছে বাইরের জিনিস, জাতির অন্তরাত্মাকে স্পর্শ করার ক্ষমতা তার নেই এবং নিজের কালসীমাকে ছাড়িয়ে নিত্যকালের দরবারে পৌঁছনো তার সাধ্যাতীত। তাই তথ্যের অতিশায়ী সত্যকে নির্দেশ করে রবীন্দ্রনাথ নারদ ঋষিকে দিয়ে বাল্মীকির উদ্দেশ্যে বলিয়াছেন—

‘সেই সত্য যা রচিবে তুমি—
ঘটে যা তা সব সত্য নহে। কবি, তব মনোভূমি
রামের জনমস্থান অযোধ্যার চেয়ে সত্য জেনো।’

— ‘কাহিনী’ ১৯০০, ভাষা ও ছন্দ

রামায়ণে বিধৃত এই ভাবসত্যের ধারা প্রাচীন কাল থেকে আজ পর্যন্ত অবিচ্ছিন্নভাবে প্রবাহিত হয়ে এসে কিভাবে পরবর্তী সাহিত্যকদের প্রেরণা জুগিয়েছে তা দেখা যাক।

পৌরাণিক যুগের পদ্মপুরাণ, অগ্নিপুরাণ থেকে কল্কিপুরাণ পর্যন্ত অন্ততঃ সাতটি পুরাণের বেশ কিছু অধ্যায় এবং শ্রীমদ্‌ভাগবত, দেবী ভাগবত বা জৈমিনি ভারতেরও

মন্তব্য

কিছু অধ্যায়ে রামায়ণিক উপকরণের সন্ধান পাওয়া যায়। পালি এবং বিভিন্ন প্রাকৃতেও রামকথা রচিত হয়েছিল। বৌদ্ধ জাতক গ্রন্থে 'দশরথজাতক'-এর সন্ধান পাওয়া যায়। পরে খ্রীঃ প্রথম শতকে বৌদ্ধ মহাকবি অশ্বঘোষ রামায়ণের আদর্শে রচনা করেন 'বুদ্ধচরিত' কাব্য। কাব্যটিকে বুদ্ধায়ন নামে অভিহিত করলেই যেন এর যথার্থ স্বরূপটি প্রকাশ পায়। তাঁর পরবর্তী কবিরা রামায়ণকে আদর্শমাত্র না রেখে সরাসরি রামকাহিনী অবলম্বন করে সাহিত্য রচনা করেন। কালিদাস (রঘুবংশ) ভবভূতি (উত্তরচরিত, মহাবীরচরিত), ভর্তৃহরি (ভট্টিকাব্য), মুরারি (অনর্ঘরাঘব)-প্রমুখ সংস্কৃত কবিরা যে রামকাহিনীর অনুসরণে কাব্য বা নাটক রচনা করেছেন তা সুবিদিত। সংস্কৃত এবং পালিতে লেখা জৈন রামায়ণও এক সময় খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল।

দক্ষিণ ভারতের দ্রাবিড় সাহিত্যও রামায়ণের অমৃতরসে পুষ্ট হয়েছে। মহাকবি কম্বনের রচিত রামায়ণ তামিল সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। কানাড়ী ভাষার পম্পা রামায়ণও উল্লেখের দাবি রাখে। তাই আচার্য সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন— 'প্রায় প্রত্যেক ভারতীয় ভাষায় অন্যতম প্রধান গ্রন্থ হইতেছে রামায়ণাশ্রয়ী কোনও না কোনও মহাকাব্য'। বাংলা ভাষায় কৃত্তিবাসী রামায়ণ ও হিন্দী কবি তুলসীদাসের 'রামচরিত-মানস' এই মন্তব্যের সত্যতা প্রকাশ করে। এমনকি ভারতের হিন্দু-মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের মিলিত চেষ্টায় ফারসী ভাষাতেও রামায়ণের একাধিক অনুবাদ হয়েছে। এছাড়া ভারতের বাইরে বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য প্রভাবের ফলে তিব্বতী, চীনা, বর্মী, মোন, শ্যাম, মালয়ী, প্রাচীন ও মধ্যযুগের যবদ্বীপীয় ও সুন্দানী ভাষায় এবং বলিদ্বীপের ভাষায় সংক্ষিপ্ত রামকথা রচিত হতে দেখা গেছে। এর থেকে বোঝা যায় কেবল ভারতবাসীর কাছে নয়, সমগ্র বিশ্ববাসীর কাছেই এ মহাগ্রন্থ তার মানবিক আবেদন ও আভ্যন্তরীণ মহত্বের গুণে এক সাহিত্যিক মহাসম্পদ বলে গণ্য হবার যোগ্য।

২.৪। সংস্কৃত রামায়ণের গুরুত্ব

কৃত্তিবাসী রামায়ণ

বাংলা কৃত্তিবাসী রামায়ণ রচিত হবার আগেই বাংলা ভাষায় না হলেও বাংলাদেশে রামায়ণচর্চা ছিল। তার প্রমাণ অভিনন্দ (আনু. খ্রী. ৯ম শতক) রচিত সংস্কৃত রামচরিত কাব্য। তাঁর পরে সন্ধ্যাকর নন্দীও (খ্রী. ১১শ - ১২শ শতক) একটি রামচরিত কাব্য লেখেন। এটি দ্ব্যর্থবোধক শ্লেষকাব্য হলেও এর বহিরঙ্গ রামায়ণকে অবলম্বন করেই

কল্পিত। মন্তব্য

খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দী থেকে আধুনিক ভারতীয় ভাষাগুলির উদ্ভবের পর সংস্কৃত রামায়ণ কাহিনী অন্যান্য ভাষার মতো বাংলা ভাষাতেও প্রচারিত হয়। তবে রামায়ণ কাহিনী তখন গান, কথকতা, ও পাঁচালী আকারে প্রচলিত ছিল। কৃত্তিবাসের রামায়াণও পাঁচালী কিংবা গান হিসেবে গাওয়া হত। কৃত্তিবাসী রামায়ণে আছে—

'বীণা যন্ত্রে কুশীলব রামায়ণ গায়।
মুনি ঋষি আদি সবে বিমোহিত তায়।।'

অবশ্য বাল্মীকি রামায়ণেও আছে এই কাব্য পাঠ্য এবং গেয়। যাই হোক কৃত্তিবাসী রামায়ণ শ্রোতাদের সামনে আসরে বসে গীত হত বলে শ্রোতাদের রুচি ও চাহিদার মুখ চেয়ে গায়কেরা নতুন নতুন বিষয় ও রসের অবতারণা করতেন। তাই বাল্মীকির আদর্শে রচিত হলেও কৃত্তিবাসী রামায়ণ আক্ষরিক অনুবাদ নয়, তা ভাবানুবাদ।—

'বাল্মীকি বন্দিয়া কৃত্তিবাস বিচক্ষণ।
পাঁচালী প্রবন্ধে রচে বেদ, রামায়ণ।।'

আসলে প্রাদেশিক ভাষার সব রামায়ণকেই দেশকালোপযোগী করতে হয়েছিল। তাই বাল্মীকি সমস্ত ভারতীয়দের জন্যে কাব্য লিখেছিলেন, কৃত্তিবাস লিখেছেন শুধু বাঙালির জন্যে। তবে একা কৃত্তিবাস এই রামায়ণের রচয়িতা নন। বাংলায় যুগে যুগে কত যে রামায়ণ লেখা হয়েছিল তার ইয়ত্তা নেই। সেই সব রামায়াণের জনপ্রিয় অংশগুলি কালক্রমে কৃত্তিবাসী রামায়াণের অন্তর্গত হয়ে গেছে এবং কৃত্তিবাস একাই সমস্ত গৌরব আত্মসাৎ করেছেন। ফলে আজকাল আমরা যে রামায়ণখানি পাই, তা শুধুমাত্র কৃত্তিবাসী রামায়ণ নয়, সেটি আসলে বাংলাদেশের জাতীয় মহাকাব্য।

১৮০২-৩ খ্রীষ্টাব্দে উইলিয়ম কেরীর চেষ্টায় শ্রীরামপুর মিশন থেকে সর্বপ্রথম সমগ্র সাতকাণ্ড রামায়ণ মোট পাঁচটি খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছিল। শ্রীরামপুরের পাদ্রীরা এদেশী পণ্ডিতদের সাহায্য নিয়ে একাজ করেছিলেন। তবে প্রাচীন গ্রন্থ সম্পাদনার আধুনিক রীতি তাঁদের জানা ছিল না। তাই হাতের কাছে রামায়ণের যে পুথি তাঁরা পেয়েছিলেন তা অবলম্বন করে এবং সে যুগের ভাষা ও শব্দ অনুসারে পুরনো পুথির পাঠ বদলে ফেলে তাঁরা রামায়ণ মুদ্রিত করেছিলেন। তাই কৃত্তিবাসী রামায়াণের প্রথম

মন্তব্য

মুদ্রিত সংস্করণে পুথির পাঠ অবিকলভাবে গ্রহণ করা হয়নি। তবে এ পর্যন্ত যত পুথি পাওয়া গেছে তা শ্রীরামপুরী সংস্করণের চাইতেও আধুনিক। যাই হোক এই সংস্করণে ছন্দের সমতার জন্যে কিছু কিছু শব্দ যোজিত হয়েছে, কিছুবা বাদ গেছে, ভাষার ত্রুটিও কিছু কিছু সংশোধিত হয়েছে। তবে পরবর্তীকালে বটতলা থেকে প্রকাশিত রামায়ণে যেমন যে কেউ যেমন খুশি হস্তক্ষেপ করেছিল, সেরকম কোনো আমূল পরিবর্তন শ্রীরামপুরের প্রথম সংস্করণে দেখা যায়নি।

১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের আগে কলকাতায় মুদ্রিত রামায়াণের কোনো কপি পাওয়া যানি। সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক জয়গোপাল তর্কালংকারের সম্পাদনায় ১৮৩০-৩৪ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামপুর মিশন থেকে রামায়ণের দ্বিতীয় সংস্করণ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। শোনা যায় জয়গোপাল নাকি বলতেন,''কৃত্তিবাসের রচনা বড় গ্রাম্য শব্দে দুষ্ট, বড়ই অশুদ্ধ, ভাবের অনেক স্থানে অসংলগ্নতা রহিয়াছে'' (সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ১৩০১)। আসলে জয়গোপাল এবং সে যুগের সাহিত্যরসিকেরা বিশ্বাস করতেন যে কৃত্তিবাসী পুথিতে অনেক ভুলত্রুটি আছে এবং মুদ্রণের সময়ে তার সংশোধন ও পরিমার্জন করা দরকার। কাব্যের অধ্যাপক জয়গোপালের নিজেরও কিছু কবিত্বশক্তি ছিল। ফলে সম্পাদনার সময়ে তিনি প্রথম সংস্করণের ত্রুটিযুক্ত পাঠ ও ছন্দোপতন সংশোধন করে এবং প্রয়োজন মতো সংযোজন করে কাব্যটি আগাগোড় সংস্কার করে দিয়েছিলেন।

এই জাতীয় সংস্কারের ফলে কাব্যটি সুখপাঠ্য হয়েছে সন্দেহ নেই, কিন্তু কৃত্তিবাস পণ্ডিতের আদি ও অকৃত্রিম রচনা আচ্ছন্ন হয়ে গেছে। অবশ্য একথাও আমরা মানতে বাধ্য যে কৃত্তিবাসের আদি ভাষা যথাযথ রক্ষিত হলে এ কাব্য কীট-কবলিত হয়ে শুধু অতি উৎসাহী গবেষকের আলোচনার বস্তু হত। এমন ব্যাপক জনপ্রিয়তা পেয়ে আধুনিককাল পর্যন্ত তার অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে পারত না। আমাদের দৈনন্দিন জীবন থেকে মানসিক ঐতিহ্যের প্রতিটি পর্যায়ের সঙ্গে কৃত্তিবাসী রামায়ণ যে অপরিহার্যভাবে জড়িয়ে গেছে, চারিত্রনীতি ও গৃহধর্মের আদর্শ থেকে প্রবাদে প্রবচনে বাগ্‌ধারায় যেভাবে ওতপ্রোতভাবে মিশে যেতে পেরেছে তার জন্যে আমরা জয়গোপালী রামায়াণের কাছে ঋণী। ইতিহাসবোধের অভাবের জন্যে তাঁকে কাঠগড়ায় দাঁড় করালেও এই সত্যটিকে আমরা অস্বীকার করতে পারব না।

মহাকবির কবিত্বে থাকে সৃষ্টিশীল কল্পনাশক্তির বিশালতা, ভাবের সমুন্নত মহিমা ও ত্রিলোকসঞ্চারী গতিবিধি। বাল্মীকির আলোকসামান্য প্রতিভা কল্পনার প্রসারে, ভাবের গাম্ভীর্যে ও ভাষার ওজিস্বিতায় তাঁর রচিত রামায়ণকে মহাকাব্য পদবাচ্য করে তুলেছে। অন্যদিকে সংকীর্ণ কল্পনা ও সীমিত অভিজ্ঞতা কৃত্তিবাসের রামায়ণকে পাঁচালি কাব্যের গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ রেখেছে। তাই বাল্মীকির মহাকাব্যিক কল্পনা যখন সমুদ্র, পর্বত ও সীমাহীন আকাশে বিচরণ করে ফিরেছে, কৃত্তিবাসের কল্পনা তখন পল্লীর কুটীরপ্রাঙ্গণ ও পানাপুকুরের সীমানা ছড়াতে পারেনি। সমুদ্র-পর্বত-অরণ্য বা বনচর পশুপাখি বাল্মীকির অরণ্যকাণ্ড, কিষ্কিন্ধ্যা বা সুন্দরকাণ্ডে বারবার এসেছে। কিন্তু সমুদ্র, পর্বত বা অরণ্য যেহেতু বাঙালী শ্রোতাদের অভিজ্ঞতার বাইরে তাই স্বভাবতঃই সে সম্পর্কে তাদের আগ্রহ জাগেনি, কৃত্তিবাসও তা বর্ণনা করতে পারেননি।

স্বতঃস্ফূর্ত কবিত্বশক্তির উল্লাসে বাল্মীকি প্রকৃতি-জগৎকে দেখেছেন এবং দণ্ডকারণ্যের শোভা, বর্ষাগমে ও শরৎকালে মাল্যবান পর্বতের সৌন্দর্য ইত্যাদি বর্ণণায় শ্লোকের পর শ্লোক রচনা করেছেন। আবার মানবমনের সঙ্গে তার সম্পর্ক, সেকালের মানুষের আচার-আচরণ, প্রমোদ ও সম্ভোগ, আযোধ্যাপুর ও স্বর্ণলঙ্কাপুরীর অতুল বৈভব ইত্যাদিও সমান দক্ষতায় ফুটিয়ে তুলে সমগ্রভাবে একটা রসঘন সাহিত্যরূপ সৃষ্টি করেছেন। এই রসদৃষ্টি ও বর্ণনানৈপুণ্য কৃত্তিবাসের কাছে আশা করা যায় না। সেইজন্যই কৃত্তিবাসের বর্ণনায় চিত্রকুট পাহাড় সমতুল বাংলার ধানখেতের পাশে নেমে আসে,কল্লোলিত সমুদ্র বাংলাদেশের খাল-বিল-জলাশয়ে পরিণত হয় আর রাম রাবণের যুদ্ধ দুই জমিদারের কলহদ্বন্দ্বে গিয়ে দাঁড়ায়।

আসলে কবিত্বময় সৌন্দর্যসৃষ্টি কৃত্তিবাসের লক্ষ্য ছিল না। তিনি বাঙালীয়ানার সঙ্কীর্ণ বাতায়ন থেকে দেখে রামকাহিনীর অন্তর্গত ঘটনার জাল বুজে গেছেন। তাই বাল্মীকি-রামায়ণে কুণ্ঠাহীন দৃষ্টিতে দেখা বৈদিক ক্রিয়াকর্ম-সমন্বিত তার উদার সর্বভারতীয় সমাজের ছবি দেখতে পাই। আর কৃত্তিবাসে পাই বাঙালীর প্রথা ও সংস্কারবদ্ধ আচার-অনুষ্ঠানের যথাযথ সমাজচিত্র। বাঙালীর নৈতিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধগুলি তাতে সযত্নে রক্ষা করা হয়েছে। অহল্যার বৃত্তান্ত বা লক্ষ্মণের গণ্ডিদান ইত্যাদি প্রসঙ্গে পাই তার প্রতিফলন।

মন্তব্য

বাল্মীকি রামায়ণে দেখি রামের জীবিতকালে বাল্মীকি ছিলেন এবং রামের জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনার (বনবাস, সীতাহরণ ও উদ্ধার ইত্যাদি) অব্যবহিত পরেই সম্ভবতঃ রামায়ণ রচনা করেছিলেন। আর কৃত্তিবাসী রামায়ণে দেখি রামজন্মের ষাট হাজার বছর আগেই বাল্মীকি রামায়ণ রচনা করেছিলেন—

'রামজন্ম পূর্বে ষাটি সহস্র বৎসর
অনাগত পুরাণ রচিল মুনিবর।।'

রাম না হতেই রামায়ণ ইত্যাদি প্রবাদবাক্যও একথা সমর্থন করে। তবে এগুলি নিতান্তই জনশ্রুতি যার কোনো ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই।

রামায়ণে বর্ণিত চরিত্রগুলির চিত্রণেও বাল্মীকি ও কৃত্তিবাসের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য চোখে পড়ে। বাল্মীকির রাম 'নরচন্দ্রমা' বা নরশ্রেষ্ঠ কিন্তু তিনি দেবতা নন। তাই সর্বগুণাধার হয়েও তিনি মানবিক দুর্বলতার অতীত নন। তিনি সাক্ষাৎ নারায়ণ হলে মারীচের রাক্ষসী মায়ায় কেন ভুলবেন? অসহ্য কষ্ট স্বীকার করে সীতার উদ্ধার সাধনের পর কোন মনোবিকারের বশে সীতাকে দেখে তাঁর মনে হবে 'নেত্ররোগীর সামনে দীপশিক্ষার মতো অসহনীয়!' মানুষী অবমাননা থেকেও মুক্তি নেই বলে তাঁকে স্বীকার করতে হয় বালীহত্যার হীনতা, সীতাবর্জনের কলঙ্ক, শম্বুকবধের অপরাধ। কিন্তু এগুলিই প্রমাণ করে যে তিনি নিতান্তই মানুষ। কিন্তু কৃত্তিবাসের ভক্তবৎসল রাম স্বয়ং বিষ্ণুর অবতার। ঘটনার দিক দিয়ে তিনি বাল্মীকির অনুসরণ করলেও তাঁর করুণাময় পতিতপাবন মূর্তিকেই কৃত্তিবাস উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত করেছেন। রামের হাতে নিহত হওয়ার সুযোগ পাওয়ার জন্যেই তরণীসেন, বীরবাহু এমন কি রাবণ পর্যন্ত স্বেচ্ছায় যুদ্ধে গেছেন। আবার কৃত্তিবাস তাঁর রামায়াণে অকারণে রামনামের মাহাত্ম্য কীতর্ন করে রামের অবতারত্বকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন।

বস্তুতঃ কৃত্তিবাসী রামায়াণে প্রধান হয়েছে দুটি রস— ভক্তিরস আর কৌতুকরস। ভক্তিরসের উপাদান সম্ভবতঃ বিভিন্ন সময়ে বৈষ্ণবধর্মেরপ্রভাব এসেছে। আর শ্রোতাদের মনোরঞ্জনের জন্যে কৃত্তিবাস কখনও উদ্ভট ও অতিরঞ্জিত উপাদান প্রয়োগ করে কখনও বক্র মন্তব্যে সরল করে কখনও বা বাঙালী সমাজসুলভ স্থূল রঙ্গ-রসিকতার মধ্যে দিয়ে হাস্যরস সৃষ্টি করেছেন। তবে সংস্কৃত শব্দ ও বাক্যের উদাত্ত ওজস্বিতায় বাল্মীকি যখন বীর ও রৌদ্ররসের ব্যঞ্জনা সৃষ্টিতে সাহসী হয়ে ওঠেন তখন পরিবেশনের উপযোগী

শব্দসম্ভারের দীনতায় ও পয়ার ছন্দের একটানা সুরের আবেশের ফলে বীররস সৃষ্টিতে ব্যর্থ হয়ে যান। তাই যথেষ্ট হুঙ্কার ও আস্ফালন সত্ত্বেও বীররসের উপযুক্ত পরিবেশ তিনি তৈরি করে উঠতে পারেননি। তেমনি বাংলা ভাষার পেলব ও নমনীয় শব্দযোজনায় ও সকরুণ তানে কৃত্তিবাস অশ্রুর প্রবাহ বইয়ে দিলেও বাল্মীকির মতো শোকের অন্তর্দাহ ও বিষাদের স্তব্ধ গাম্ভীর্য সৃষ্টি করতে পারেনি।

বাল্মীকির প্রতিটি শ্লোকই প্রায় অলংকার-ভূষিত কিন্তু সেই অলংকার স্বচ্ছন্দ ও সংক্ষিপ্ত। উপমা অলংকারই বেশি। আর তিনি সমুদ্র, পর্বত বা আকাশ থেকে তাঁর উপমান আহরণ করেছেন। কিন্তু কৃত্তিবাস তাঁর অতি চেনা পল্লীর দৈনন্দিন অভিজ্ঞতাকে ভিত্তি করে 'কলার বাগুড়ি' কিংবা 'কুমোরের চাক' থেকে উপমান সংগ্রহ করে ফেরেন। অবশ্য প্রথাসিদ্ধ সংস্কৃত অলংকারও তিনি ব্যবহার করেছেন।—

'চরণে নুপুর বাজে রুনুঝুনু শুনি।
নীলপদ্ম কোলে যেন হংস করে ধ্বনি।।'

কিন্তু দেশীয় উপমা ব্যবহারেই তিনি বেশি স্বচ্ছন্দ। ধ্বন্যাত্মক শব্দ ও অনুপ্রাসের ব্যবহার কৃত্তিবাসে প্রচুর। যেমন—

'শ্রীরাম আইল দেশে পড়ে গেল সাড়া।
ঝা গুড়গুড় বাদ্য বাজে নাচে চন্ডাল পাড়া।।'

কিংবা— 'ডাল ভাঙ্গে হনুমান হব্দ মড়মড়ি।
আতঙ্কে রাক্ষস সব উঠে দড়বড়ি।।'

শব্দ ও বাক্য ব্যবহারে বাল্মীকির অনায়াস স্বচ্ছন্দ্য চোখে পড়ার মতো। বাল্মীকির সরল প্রাঞ্জল ভাষায় প্রসাদগুণ কিশোর রবীন্দ্রনাথেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল (মেঘনাদবধ কাব্যের সমালোচনা)। অবশ্য কৃত্তিবাসের ভাষাও সহজ ও সরল। তবে তাতে মহাকাব্যিক মহিমা নেই। তাঁর রামায়াণে ছড়া-পাঁচালীতে ব্যবহৃত শব্দ প্রয়োগরীতি অনেক সময়েই চোখে পড়ে। যেমন 'সুবুদ্ধি পরশুরামে কুবুদ্ধি লাগিল' ইত্যাদি।

রামায়ণের প্রতিটি কাণ্ড অবলম্বনে বিষয়বিন্যাস, চরিত্রচিত্রণ বা কাব্যসৌন্দর্য সৃষ্টির দিক দিয়ে বাল্মীকি ও কৃত্তিবাসের তুলনা করা যেতে পারে। পরবর্তী কাহিনীবিন্যাস,

মন্তব্য

চরিত্রসৃষ্টি, রসবিচর ও বাঙালীয়ানা অধ্যায়গুলিতে এবিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা দেওয়া আছে। এখানে তার পুনরুক্তি না করে মোটের ওপর বলা যায় যে কৃত্তিবাস আর্য রামায়ণের বিশাল ও ব্যাপক কাহিনীর মহাকাব্যোচিত গতিময়তার মর্যাদা রাখতে পারেননি। অনেক জায়গাতেই তিনি মূল কাহিনীকে সঙ্কুচিত করে নিয়েছেন। কৃত্তিবাসের আঁকা চরিত্রগুলিও ভাবাদর্শের মহনীয়তা বা অমানুষিক বর্বরতা কোনদিক দিয়েই মহাকাব্যের যোগ্য হয়ে ওঠেনি। সৌন্দর্যসৃষ্টি সম্বন্ধে উদাসীন কৃত্তিবাসের রচনায় বাল্মীকি বর্ণিত নিসর্গসৌন্দর্যের কোনো জায়গা হয়নি। ভাষা এবং অলংকার প্রয়োগেও কৃত্তিবাসের সীমাবদ্ধতা তাঁর রামায়ণকে মহাকাব্যের গৌরব থেকে বিচ্যুত করেছে। তবে কৃত্তিবাস যে নিখুঁত নৈপুণ্যে বাঙালীর মনোভাবের অনুকূল করে বাঙালী সমাজকে, তার জাতীয় জীবনের ভাবাদর্শকে তুলে ধরেছেন তাতে তা বাঙালীর জীবনকাব্য হয়ে উঠেছে। কৃত্তিবাসী রামায়াণের আসল গৌরব এইখানেই।

২.৫। আত্মমূল্যায়নধর্মী প্রশ্ন

১। কৃত্তিবাসী ‘রামায়ণ’-এর প্রকাশ বিষয়ে যা জানেন লিখুন।

২। মহাকবি বাল্মীকি ও কৃত্তিবাসী রামায়ণের তুলনামূলক আলোচনা করুন।

৩। কৃত্তিবাসী রামায়ণে কবি পরিচিতি উল্লেখ করো।

৪। কৃত্তিবাস সমস্যা আলোচনা করো।

৫। কৃত্তিবাসী রামায়ণের ওপর সংস্কৃত রামায়াণের প্রভাব আলোচনা করো।

২.৬। সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

১। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত - অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

২। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস - দেবেশ আচার্য।

৩। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস - ড. ক্ষেত্র গুপ্ত।

৪। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস - শ্রীমন্ত কুমার জানা।

একক-৩ কৃত্তিবাসের কাব্যকাহিনীর মৌলিকতা ও মূলানুগত্যের পরিচয়, চরিত্র বিচার, রস বিচার এবং অনুবাদক হিসেবে কৃত্তিবাসের অবদান।

বিন্যাসক্রম —

৩.১ কাহিনী বিন্যাসে কৃত্তিবাসের ঋণ

৩.২ কাহিনী বিন্যাসে কৃত্তিবাসের মৌলিকতা ও মূলানুগত্যেরপরিচয়

৩.৩ কৃত্তিবাসী রামায়ণের চরিত্র বিচার

৩.৪ কৃত্তিবাসী রামায়াণের রস বিচার

৩.৫ রামায়াণ অনুবাদক হিসেবে কবি কৃত্তিবাসের অবদান

৩.৬ আত্মমূল্যায়নধর্মী প্রশ্ন

৩.৭ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

৩.১ কাহিনীবিন্যাসে কৃত্তিবাসের ঋণ

মূল বাল্মীকি রামায়ণ ও কৃত্তিবাস-বর্ণিত রামায়ণ কাহিনীর মধ্যে বেশ কিছু পার্থক্য চোখে পড়ে। অবশ্য তার মানে এই নয় যে বাল্মীকির রামায়ণের সঙ্গে কৃত্তিবাস পরিচিত ছিলেন না এবং শুধু গায়ক বা কথকের মুখে শুনেই রামায়ণ রচনা করেছিলেন। আসলে কৃত্তিবাস মূল রামায়ণের অবিকল অনুসরণ করেনি। তবে কৃত্তিবাস যে বাল্মীকি-রামায়ণ পড়েছিলেন তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। অনেক জায়গাতেই তিনি পূর্বসূরীর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন।—

‘বাল্মীকি বন্দিয়া কৃত্তিবাস বিচক্ষণ।
শুভক্ষণে বিরচিল ভাষা রামায়ণ।।’

— রামায়ণ ১৯৮৩ সাহিত্য সংসদ,
কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড

আবার কৃত্তিবাসের আত্মবিবরণীটি সত্য হলে তাঁকে তো সংস্কৃত ভাষায় পরম পণ্ডিত বলে ধরে নিতে হবে। প্রাচীন কুলজী গ্রন্থেও তাঁকে সর্বদা পণ্ডিত বলে উল্লেখ করা হয়েছে। রামায়ণের ভণিতাতেও তিনি নিজের নামের সঙ্গে পণ্ডিত বিশেষণটি ব্যবহার করেছেন।

মন্তব্য

যাইহোক রামায়ণ রচনা করতে বসে কৃত্তিবাস মূল বাল্মীকি থেকে কাহিনীর সারভাগটুকু নিয়ে, পুরাণ বা অন্যান্য রামায়ণের ঘটনা এবং নিজের কল্পনা মিশিয়ে পুরনো রামকথাকে বাংলাদেশের অনুকূল করে পরিবেশন করেছিলেন। সুতরাং বাল্মীকি রচিত কাহিনীর কিছু কিছু অংশ তিনি বর্জন করেছিলেন। সেই বর্জিত অংশগুলির মধ্যে প্রধান হল—

১. কার্তিকের জন্ম ২. বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্র বিরোধ ৩. বিশ্বামিত্র কথা ৪. অম্বরীষ রাজার যজ্ঞ ৫. রামের আদিত্য-হৃদয় স্তবপাঠ ইত্যাদি।

কখনও কখনও কৃত্তিবাস বাল্মীকির বদলে বিভিন্ন পুরাণ বা অন্যান্য রামায়ণ থেকে কাহিনী চয়ন করেছেন। এবার তার কিছু দৃষ্টান্ত দেওয়া হল।

১. বাল্মীকি রামায়ণে বালাকাণ্ডের শুরুতেই দেখি নারদ বাল্মীকিকে রামায়ণ রচনার আদেশ দিচ্ছেন। এ গ্রন্থে রত্নাকর দস্যুর প্রসঙ্গ নেই। আর ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি দশরথের পুত্র কামনায় যখন পুত্রেষ্টি যজ্ঞ শুরু করেন তখন দেবতাদের অনুরোধে বিষ্ণু রাবণবধের জন্য দহরথের পুত্রত্ব স্বীকার করেন। কৃত্তিবাস তাঁর আদিকাণ্ডের সূচনায় বাল্মীকির অনুসরণ করেননি। তিনি অধ্যাত্ম রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডের বর্ণনা অনুসারে বিষ্ণুর স্বেচ্ছায় চার অংশে বিভক্ত হয়ে (রাম-ভরত-লক্ষ্মণ) শত্রুঘ্ন অবতার ব ন ে প জন্মগ্রহণের বিবরণ দিয়েছেন। তারপর রামনামের মাহাত্ম্যে রত্নাকর দস্যুর বাল্মীকিতে রূপান্তর ও রামায়ণ রচনার জন্য ব্রহ্মার আদেশপ্রাপ্তির কাহিনী।

২. আদি কাণ্ডের হরিশ্চন্দ্রের উপাখ্যান কৃত্তিবাস দেবী ভাগবত ও মার্কণ্ডেয় পুরাণ থেকে নিয়েছেন।

৩. এই কাণ্ডে বর্ণিত ভগীরথের জন্মবৃত্তান্ত যোগবশিষ্ঠ রামায়ণ ও পদ্মপুরাণ থেকে নেওয়া।

৪. কাণ্ডার মুনির উপাখ্যানটি কৃত্তিবাস স্কন্দপুরাণের কাশীখণ্ড থেকে নিয়ে আদিকাণ্ডের গঙ্গাবতরণ প্রসঙ্গে বর্ণনা করেছেন।

৫. দশরথের রাজ্যে শনির প্রকোপের বিবরণও তিনি স্কন্দ ও কালিকাপুরাণ থেকে গ্রহণ করে আদিকাণ্ডের অন্তর্গত করে দিয়েছেন।

সুন্দরাকাণ্ডে

সেতুবন্ধনের সময়ে রামের শিবপ্রতিষ্ঠার যে বিবরণ কৃত্তিবাস দিয়েছেন তার উৎস হল কূর্মপুরাণ। মন্তব্য

লঙ্কাকাণ্ড বর্ণিত

১. চণ্ডিকার অকালবোধনের কাহিনী কৃত্তিবাস দেবী ভাগবত, বৃহদ্ধর্মপুরাণ ও কালিকাপুরাণ থেকে নিয়েছেন।

২. মেঘনাদের সঙ্গে যুদ্ধে রামলক্ষ্মণ মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লে জাম্বুবান হনুমানকে ঋষ্যমূক পর্বত থেকে ওষুধ আনতে বলেন এ কাহিনী কৃত্তিবাস কোথা থেকে পেয়েছিলেন, নিজেই তা উল্লেখ করে দিয়েছিলেন।—

‘নাহিক এসব কথা বাল্মীকি রচনে।
বিস্তারিয়া লিখিত অদ্ভুত রামায়ণে।।’

৩. গন্ধমাদন পর্বত থেকে বিশল্যকরণী আনার সময়ে হনুমানকে কালনেমির বাধাদানের বৃত্তান্ত অধ্যাত্ম রামায়ণের অনুসরণে লেখা। শুধু ধান্যমালী অপ্সরা এখানে হয়েছে গন্ধকালী।

৪. অযোধ্যায় ফিরে সীতা হনুমানকে যে স্বর্ণহার পুরস্কার দিয়েছিলেন তাতে রামনাম লেখা ছিল না বলে হনুমান তা খণ্ড খণ্ড করে ফেলে দেন। লঙ্কাকাণ্ডের এই ঘটনা কৃত্তিবাস অধ্যাত্ম রামায়ণ অনুসারে বর্ণনা করেছেন।

উত্তরাকাণ্ডে লব কুশের হাতে ভরত, শত্রুঘ্ন ও লক্ষ্মণ পরাজিত ও নিহত হলে তাঁরা যে বাল্মীকির প্রসাদে পুনর্জীবিত হন, এই বৃত্তান্তটির উৎস কৃত্তিবাস নিজেই নির্দেশ করে বলেছেন—

‘এসব গাহিল গীত জৈমিনি ভারতে।
সম্প্রতি যে গাই তাহা বাল্মীকির মতে।।’

কাহিনী বর্ণনা-প্রসঙ্গে কৃত্তিবাসের এই জাতীয় ঋণস্বীকার থেকে এই তথ্যটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে বিভিন্ন সংস্কৃত রামায়ণ ও পুরাণের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। সুতরাং সংস্কৃত ভাষার ওপর তাঁর-যে পূর্ণ অধিকার ছিল তাতে সন্দেহ থাকে না।

কৃত্তিবাসী রামায়ণের কতকগুলি উপাখ্যান কৃত্তিবাসের নিজস্ব কবিকল্পনার সৃষ্টি। এই মৌলিক কাহিনীগুলি হল—

মন্তব্য

আদিকাণ্ডে ১. সৌদাস-দিলীপ-রঘুর কাহিনী ২. জটায়ু ও শনির কাহিনী ৩. গণেশের জন্ম ৪. সম্বরাসুর বধ ৫. গুহকের সঙ্গে মিত্রতা ইত্যাদি উপাখ্যান।

অরণ্যকাণ্ডে সীতা হরণের আগে লক্ষ্মণের গন্ডী দেওয়ার বৃত্তান্তটি কৃত্তিবাসের সংযোজন।

কিষ্কিন্ধকাণ্ড ১. বালীরাজার সন্ধ্যাহ্নিক ২. রাবনণকে লেজে বেঁধে লাঞ্ছনা ৩. বালীবধে তারার অভিশাপ ৪. সতীত্বের প্রশস্তি ৫. সম্পাতির কাছে হনুমানের রত্নাকর ও রামের কাহিনীকীর্তন ইত্যাদিও কৃত্তিবাসের কল্পনা।

সুন্দরাকাণ্ডের সিংহিকাবৃত্তান্ত ও চামুণ্ডাপ্রসঙ্গ কৃত্তিবাসের সংযোজন।

এই সূত্রে বলতে ১. রাবণ-বিভীষণ বাদানুবাদ ২. রামের সঙ্গে বিভীষণের মিত্রতা ৩. সমুদ্রে সেতুবন্ধন ও ৪. রামের সসৈন্যে লঙ্কায় আগমন ইত্যাদি ঘটনাগুলি কৃত্তিবাস সুন্দরাকাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত করেছেন যেগুলি বাল্মীকির রামায়ণে যুদ্ধ কাণ্ডের অন্তর্গত ছিল। তবে এই পরিবর্তনে সুন্দরাকাণ্ডের ঘটনাগত ঐক্য ক্ষুণ্ণ হয়েছে বলেই মনে হয়।

লঙ্কাকাণ্ডে কৃত্তিবাস অনেক নতুন বিষয়ের অবতারণা করেছেন।—

১. তরণী সেন-বীরবাহু-ভস্মলোচন বধ ২. সূর্যকে হনুমানের কক্ষতলে ধারণ ৩. মহীরাবণ ও অহিরাবণ বধ ৪. অকাল বোধনে ১০৮টি নীলপদ্মের কাহিনী ৫. ছদ্মবেশী হনুমানের মন্দোদরীর কাছ থেকে রাবণের মৃত্যুবান হরণ ৬. সীতার প্রতি মন্দোদরীর অভিশাপ এব ৭. মুমূর্ষু রাবণের কাছে রামের রাজনীতি শিক্ষা প্রভৃতি উপাখ্যানগুলি কৃত্তিবাসের স্বকীয় উদ্‌ভাবনা। এগুলি নিঃসন্দেহে তাঁর মৌলিক কবিপ্রতিভার পরিচয় দেয়।

কাহিনী বিন্যাসে কৃত্তিবাসের কৃতিত্ব বিচার করতে গেলে প্রথমেই মনে রাখতে হবে পুথির মধ্যে কৃত্তিবাসের যে আদি কাব্যরূপের সন্ধান পাওয়া যায় তার কাহিনী ছিল অতি শিথিল। জয়গোপাল তর্কালংকার বা মোহনচাঁদ শীলের পরিমার্জনার ফলে কাহিনীটি কিছুটা সংহত আকার ধারণ করেছে। বর্তমান আলোচনা সেই পরিমার্জিত সংস্কারণের ভিত্তিতেই করা।

বর্তমান রামায়ণে ঘটনা ও চরিত্র বর্ণনায় কিছু শিথিলতা থাকলেও সাতটি কাণ্ডের মধ্যে যে কাহিনীগত ঐক্য নেই তা নয়। কৃত্তিবাসী রামায়ণে সুলভ ভক্তির আবেগ উচ্ছ্বাস, কারণ অশ্রুর প্রবাহ, নিয়তি-নির্ধারিত জীবন-পবিণতি ইত্যাদ বিষয় বাল্মীকির

মহাকাব্যিক কাহিনীর বিশালতা ও গভীরতাকে ক্ষুণ্ণ করলেও মোটের ওপর কাহিনীগত পারস্পর্য ও সংহতি রক্ষিত হয়েছে। অবশ্য তাড়কাবধ, হনুমানের গন্ধমাদন পর্বত আনা, ভরতের ছোঁড়াগুলি (বাঁটুল) লেগে আকাশ থেকে হনুমানের পড়ে যাওয়া, কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ ইত্যাদি শিশুতোষ কাহিনীগুলি কৃত্তিবাসের অতিরঞ্জনের ফলে অবিশ্বাস্য হয়ে উঠেছে। তার কারণ হিসবে জনৈক সমালোচক মন্তব্য করেছেন— 'কৃত্তিবাসের সময়ে বাঙালীর চিত্ত অনেকটা শিশুচিত্তের মত সরল, কল্পনাপ্রবণ ও কৌতুহলী ছিল।' এই কাহিনীগুলি তাঁরা উপভোগ করতে। অবশ্য পাশ্চাত্যের গ্রীক পুরাণে বা হোমার থেকে মিল্টনের কাব্যে পর্যন্ত অনেক অতিলৌকিক কাহিনীর সন্ধান পাওয়া যায়। প্রাচ্যেও রামায়ণ-মহাভারতে বা পুরাণে অনেক অনৈসর্গিক ঘটনার বর্ণনা আছে। আসলে তখন বৈজ্ঞানিক নানা সত্য ও আধুনিক যুক্তিবাদের জন্ম হয়নি। কাজেই এইসব শিশুসুলভ কাহিনীর জন্যে কৃত্তিবাসকে দোষী করা চলে না।

যাই হোক কৃত্তিবাসের কাহিনী বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে তিনি তাঁর কাব্যে মহাকাব্যিক গতিশীলতা বজায় রাখতে পারেননি। অনেক জায়গাতেই মূল কাহিনী কেটে ছেঁটে ছোটো করে নিয়েছেন। বাল্মীকির নিসর্গ বর্ণনার অপরূপ কবিত্ব ও মাধুর্যের স্বাদ কৃত্তিবাসে কিছুই পাওয়া যায় না। কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডের বর্ষা ও শরৎ ঋতুর বর্ণনা তো কৃত্তিবাস পুরোপুরি বাদই দিয়েছেন। তবু কৃত্তিবাসের কাহিনীতে (১) দশরথের সিন্ধুবধ (২) রামের নির্বাচন ও ভরতমিলন (৩) সীতাহরণে রামের বিলাপ (৪) লক্ষ্মণের শক্তিশেল (৫) সীতার অগ্নিপরীক্ষা (৬) সীতা নির্বাসন (৭) লুবকুশের হাতে রামসেনার পরাজয় (৮) সীতার পাতাল প্রবেশ (৯) রামের লক্ষ্মণ বর্জন (১০) হনুমানের দাস্যভক্তি ইত্যাদি বর্ণনায় মানবরস বিশেষ উপভোগ্য হয়েছে— মানবজীবনের সুখদুঃখের চেনা রূপটি স্পষ্টতর হয়ে উঠেছে। মহাকবির আকাশচারী কল্পনা গ্রাম বাংলার চণ্ডীমণ্ডপে ও ঘরের আঙিনায় নেমে এসে বাঙালীর জীবনকাব্যে রূপ লাভ করেছে।

৩.২ কাহিনী বিন্যাসে কৃত্তিবাসের মৌলিকতা ও মূলানুগত্যের পরিচয়

প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে একটি বিশিষ্ট শাখা অনুবাদ সাহিত্য। এই শাখাটি সুদীর্ঘকাল ধরে প্রবাহিত ছিল। অনুবাদ সাহিত্যের সূচনা ঘটেছিল সংস্কৃত রামায়ণ, মহাভারত এবং ভাগবত পুরাণাদির অনুবাদের মধ্য দিয়ে। কেননা রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবত

মন্তব্য

আমাদের নৈতিক ও সামাজিক জীবন গড়ে তুলেছিল। তাই এগুলির প্রতি সেকালের মানুষের দৃষ্টি ছিল সর্বাধিক। অনুবাদ হ'ল কোন বিষয়ের এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় রূপান্তর। পরবর্তীকালে অনুবাদের চাহিদাগত প্রকৃতির পরিবর্তন ঘটলেও, মধ্যযুগে মানুষ সর্বাগ্রে গল্প চাইত, সুখী হোত কাহিনী শ্রবণ করে। ''অর্থাৎ সেকালে আক্ষরিক অনুবাদের চেয়ে ভাবানুবাদের দিকে তাঁদের অধিকতর দৃষ্টি ছিল। কৃত্তিবাসের পাঁচালী কাব্যও মূলের অবিকল অনুসরণ নয়, আক্ষরিক অনুবাদ তো নয়-ই'' (বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত ঃ ড. অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়)। অনুবাদ প্রধানতঃ তিনরকমের— (১) আক্ষরিক (২) ভাবানুবাদ ও (৩) বিষয়য়ানুবাদ। আক্ষরিক অনুবাদে শব্দ সম্পদ অক্ষুণ্ণ রেখে প্রায় সমপরিসরে ভাষান্তরিত করতে হয়। ভাবানুবাদ এবং বিষয়ানুবাদে বর্ণিত কাহিনীর সার সংক্ষেপ করে স্বাধীনভবাবে প্রকাশ করাই প্রধান লক্ষ্য হয়ে ওঠে। রামের আক্ষেপ প্রসঙ্গে কৃত্তিবাস বর্ণনা করছেন—

'সজল জলদ শোভে বিদ্যুৎ যেমন।
জানকী আমার কোলে ছিলাম তেমন।।'

মূল রামায়ণে কিন্তু অন্য বর্ণনা মেলে—

'নীল মেঘাশ্রিতা বিদ্যুৎস্ফুরন্তী প্রতিভাতি মে।
সফুরন্তী রাবণস্যাঙ্কে বৈদেহীব তপস্বিনী।।'

কবি কৃত্তিবাস স্বাধীন অনুবাদের মানসিকতায় রাবণের জায়গায় রামকে গ্রহণ করেছেন। আদর্শ এবং প্রতিবেশের ভিন্নতাই বাংলা ভাষায় রামায়ণ-মহাভারতের অনুবাদে এই ভাবানুবাদকে অবলম্বন করেছে।

কৃত্তিবাসের সংস্কৃত না জানার সংশয় বিতর্ককে আলোচনায় নিয়ে এসে বলা যায়— কৃত্তিবাস যথেষ্ট ভাল সংস্কৃত জানতেন। সেই কারণে প্রাচীন কুলজীগ্রন্থে তাঁকে 'পণ্ডিত' বলে সম্মান জানানো হয়েছে। কবি সেই সংস্কৃত জ্ঞানের সাহায্যেই অনুবাদ কর্মে বাল্মীকির সংস্কৃত রামায়ণকে প্রধানত অনুসরণ করেছিলেন। কৃত্তিবাসের নিজের বর্ণনার মধ্যেই তার প্রমাণ মেলে—

''মুনি মধ্যে বাখানি বাল্মীকি মহামুনি।
পণ্ডিতের মধ্যে বাখানি কৃত্তিবাস গুণী।।

বাপ মায়ের আশীর্বাদ গুরুর কল্যাণ।

বাল্মীকি প্রসাদে রচে রামায়ণ গান।

সাত কাণ্ড কথা হয় দেবের সৃজিত।

লোক বুঝাইতে কৈল কৃত্তিবাস পণ্ডিত।।"

কৃত্তিবাস এই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছেন। সমগ্র ভারতাত্মার প্রতিভূ আর্য রামায়ণকে অনুসরণে, মৌলিকতায়, স্বাধীন চিন্তনে-একেবারে বাঙালির ঘরের সামগ্রীতে পরিণত করেছেন। কৃত্তিবাসের এই সাফল্যের পেছনে তাঁর বাঙালিয়ানা যতখানি দায়ী, একইভাবে সমানরূপে গুরত্ব দিতে হয় বাল্মীকি রামায়ণের পাশাপাশি অন্য উৎস থেকে কাহিনী সংগ্রহে এবং নিজ কল্পনা থেকে কাহিনি গড়ে তোলার স্বাধীনতায়। অন্য জায়গা থেকে কাহিনি সংগ্রহের প্রসঙ্গক্রমে লঙ্কাকাণ্ডে মেঘনাদের সঙ্গে যুদ্ধে রামচন্দ্র ও লক্ষণ মূর্ছিত হলে হনুমানের ঔষধ আনা বিষয়ে কৃত্তিবাসের উক্তি—

নাহিক এসব কথা বাল্মীকি বচনে।

বিস্তারিয়া লিখিত অদ্ভুত রামায়ণে।।

এক রামায়ণ শত সহস্র প্রকার।

কে জানে প্রভুর লীল কত অবতার।।

একইভাবে উত্তরকাণ্ডে লব কুশের দ্বারা পরাজিত ও নিহত এবং বাল্মীকির দ্বারা ভরত, শত্রুঘ্ন ও লক্ষণের পুনর্জীবন লাভের কাহিনী কৃত্তিবাস অন্য জায়গা থেকে সংগ্রহ করেছেন—

'এ সব গাহিল গীত জৈমিনি ভারতে।'

কৃত্তিবাস বাল্মীকির যে কাহিনিগুলি বর্জন করেছেন সেগুলি হল— ১) কার্তিকের জন্ম, ২) বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্র বিরোধ, ৩) বিশ্বামিত্র কথা, ৪) অম্বরীশ যজ্ঞ, ৫) রামচন্দ্র কর্তৃক আদিত্য-হৃদয় স্তব পাঠ। এই সব কাহিনীর উৎস রামায়ণ ও পুরাণ নয়। নিজ কল্পনা বলে আরো যে সব কাহিনি কৃত্তিবাস নির্মাণ করেছেন, সেগুলি হ'ল— ১) সৌদাস-দিলীপ-রঘুর কাহিনি, ২) দশরথের রাজ্যে শনির দৃষ্টি, ৩) গণেশের জন্ম, ৪) সম্বরাসুর বধ, ৫) কৈকেয়ীর বরলাভ, ৬) গুহকের সঙ্গে মিতালি, ৭) হনুমান কর্তৃক সূর্যকে কক্ষতলে ধারণ, ৮) বীরবাহুর যুদ্ধ, ৯) তরণীসেন-মহিরাবণ অহিরাবণ কাহিনী,

মন্তব্য

১০) রাবণ বধের জন্য রামচন্দ্র কর্তৃক দেবী চণ্ডিকার অকালবোধন ও ১০৮টি নীলপদ্মের কাহিনি, ১১) গণকের ছদ্মবেশে হনুমান কর্তৃক মন্দোদরীর কাছ থেকে রাবণের মৃত্যুবাণ হরণ, ১২) মুমূর্ষ রাবণের নিকট রামচন্দ্রের রাজনীতি শিক্ষা, ১৩) দেওর-বধূদের অনুরোধে সীতা কর্তৃক খড়িদ্বারা রাবণের মূর্তি অঙ্কন, ১৪) ছবি দেখে রামের মনে সীতা সম্বন্ধে সংশয়, ১৫) লব-কুশের যুদ্ধ। ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মনে করেন, ''অবশ্য সূক্ষ্মভাবে বিচার করে দেখলে মনে হবে, কৃত্তিবাস বাল্মীকির কোনো কোনো কাহিনি ইচ্ছামতো রদবদল করে নিয়েছেন। কোথাও বা অন্য পুরাণ থেকে গল্প সংগ্রহ করেছেন'' (বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত ঃ ১ম খণ্ড)। এই ধরনের বেশকিছু কাহিনির পরিচয় মেলে। আদিকাণ্ডে রত্নাকর দস্যুর 'মরা মরা' বলে পাপমুক্তি ঘটেছিল. অধ্যাত্ম রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে এ কাহিনির পরিচয় মেলে, বাল্মীকির রামায়ণে যার পরিচয় নেই। কৃত্তিবাস সম্ভবতঃ দেবী ভাগবত ও মার্কণ্ডেয় পুরাণ থেকে হরিশ্চন্দ্রের উপাখ্যান সংগ্রহ করেছিলেন। যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ ও পদ্মপুরাণে ভগীরথের জন্মবৃত্তান্ত মেলে, যা বাল্মীকি রামায়ণে নেই। গঙ্গা আনয়ন প্রসঙ্গে যে কান্ডার মুনির গল্প বলেছেন কৃত্তিবাস তার কাহিনি সংগ্রহ করেছেন স্কন্দ পুরাণের কাশী খণ্ড থেকে। ''সেতু বন্ধনের সময়ে রামচন্দ্র যে শিব প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন তা বাল্মীকিতে না থাকলেও কুর্ম পুরাণে এবং বিশল্যকরণী ঔষধ আনবার সময়ে কালনেমির বাধা দেবার কাহিনি অধ্যাত্ম রামায়ণে আছে। কেবল ধান্যমালী অপ্সরাকে কৃত্তিবাস 'গন্ধকালী'তে রূপান্তরিত করেছেন'' (বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত ঃ ১ম খণ্ড, ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়)। একইভাবে দেবীর অকালবোধন দেবী ভাগবত, বৃহদ্ধর্ম পুরাণ এবং কালিকাপুরাণে বর্ণিত। সহস্রস্কন্ধ রাবণ বধের জন্য সীতার দেহ থেকে চৌষট্টি যোগিনীর আবির্ভাব অদ্ভুত রামায়ণে মেলে। কুম্ভকর্ণ হত্যা বর্ণনায় এই চৌষট্টি যোগিনীকে কাজে লাগিয়েছেন কৃত্তিবাস। অধ্যাত্ম রামায়ণে পাওয়া যায় যে, রামের রাজ্য প্রাপ্তির পর সীতার দেওয়া মূল্যবান স্বর্ণহারে রাম নাম না থাকার কারণে হনুমান দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে ফেলেন। স্কন্দপুরাণ ও কালিকা পুরাণ থেকে দশরথের রাজ্যে শনির প্রকোপের কাহিনি গ্রহণ করেছেন কৃত্তিবাস। অন্যদিকে লব-কুশের সঙ্গে রাম ও ভরত-লক্ষ্মণ-শত্রুঘ্নের যুদ্ধ বর্ণনার কাহিনির উৎস জৈমিনি ভারত।

বিভিন্ন দিক থেকে আলোচনা এবং এই সমস্ত দৃষ্টান্ত থেকে একটি কতাই প্রমাণ

করা যাচ্ছে যে, কৃত্তিবাসী রামায়ণের কোনো কোনো কাহিনীর উৎস বিভিন পুরাণ, কোনো কোনো কাহিনি নিজের কল্পনা প্রসূত। কাহিনি বাদ দিলে কৃত্তিবাস তাঁর গ্রন্থে এমন অনেক উক্তি করেছেন, যেগুলি স্পষ্টই সংস্কৃত উদ্ভট কবিতা। যেমন— মন্তব্য

ক. পুরুষের অষ্টগুণ স্ত্রীলোকের কাম।

তাহার বৃত্তান্ত কহি শুনহ শ্রীরাম।।

স্বভাবে পুরুষ হতে কামে মত্তা নারী।

তবু স্ত্রীলোকের মন বুঝিতে না পারি।। (উত্তরাকাণ্ড)

তুল্য উৎস

আহারো দ্বিগুণস্তাসাং বুদ্ধি স্তাসাং চতুর্গুণা

ষড়গুণা মন্ত্রণা তাসাং কামশ্চাষ্টগুণ স্মৃতঃ।। (মনুসংহিতা)

খ. পরম প্রচন্ড প্রভু তব কোপানল।

সীতা যার শ্বাসবায়ু পরম প্রবল।।

লঙ্কাপুরী শুষ্ক কাষ্ঠ জ্বলিয়াই ছিল

এ হনু নিমিত্তমাত্র তথায় জুটিল।। (সুন্দরাকাণ্ড)

তুল্য উৎস

রামকোপানলেনৈব সীতা নিহ্বাসবায়ুনা।

দগ্ধাপুরৈব লঙ্কেয়ং নিমিত্তসভবৎ কপিঃ।। (ভবভূতির মহানাটক)

কাহিনী নির্মাণে এই জাতীয় মৌলিকতার পাশাপাশি ভক্তির প্রসঙ্গে কৃত্তিবাসের কবিত্ব সম্পর্কে ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন, ‘‘ছোট-বড় ঘটনা বাদ দিলেও কৃত্তিবাসের রচনায় যে ভক্তির স্পষ্ট প্রভাব আছে, তা হচ্ছে তাঁর মৌলিক অবদান। বাস্তবিক কৃত্তিবাসের ভক্তিবাদ বাল্মীকি থেকে সম্পূর্ণ পৃথক ব্যাপার’’ (বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত ঃ ১ম খণ্ড)। তবে এই ভক্তবাদ কৃত্তিবাসের একেবারে নিজস্ব ব্যাপার নয়। রামকথা সমৃদ্ধ বিভিন্ন পুরাণ। কিংবা অধ্যাত্ম রামায়ণ, যোগবাশিষ্ট রামায়ণ প্রভৃতি রামায়াণ কাব্যে রাবণ, মন্দোদরী, কুম্ভকর্ণ, বিভীষণ ও কালনেমি প্রচ্ছন্ন রামভক্তরূপেই উপস্থিত হয়েছেন। রাবণের ভক্তি আকাঙ্ক্ষাটিও বড় অদ্ভুত রকমের। রামের হাতে মৃত্যু ঘটলে অন্তিমে মুক্তিলাভ হবে, এই বাসনা থেকেই রাবণের সীতা হরণ। এই ভক্ত

মন্তব্য

রাবণকে অধ্যাত্ম রামায়ণে মেলে। এছাড়া নানা পুরাণ-উপপুরাণ এবং বিভিন্ন রামায়ণে অনেক আগে থেকেই যে রামভক্তিবাদ প্রতিষ্ঠিত; কৃত্তিবাস স্পষ্টতঃ তাকেই অনুসরণ করেছেন। তবে ভক্তির প্রসঙ্গেও কৃত্তিবাসের যে মৌলিকতা তা পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত বাঙালি কবির মনোগঠন অনুসারী বাঙালিসুলভ ভক্তিভাবের উপরে। কৃত্তিবাসী রামায়ণের এটাই অনন্য সুলভ বিশিষ্টতা।

অনুবাদের ক্ষেত্রে কৃত্তিবাস,বাল্মীকি রামায়ণের অনুকরণ করেননি, অনুসরণ করেছেন। বাঙালি কবির কোমল মানসিকতার গুণে আর্য রামায়ণের বিস্তৃতি, গতি এবং ক্ল্যাসিক মহিমা-কৃত্তিবাস তাঁর 'শ্রীরাম পাঁচালি'-তে রক্ষা করেননি। তাছাড়া বাল্মীকির কবি-প্রতিভা কৃত্তিবাসের মধ্যে প্রত্যাশাও করা যায় না। কৃত্তিবাস সুলভ ভক্তির আবেগ, করুণরসের অশ্রুপ্রবাহ, নামভক্তিবাদ এবং অদৃষ্ট নির্ধারিত মানবভাগ্য বর্ণনায় অতুলনীয়। তাই সমগ্র ভারতাত্মার প্রতিভূ বাল্মীকি-রামায়ণ কৃত্তিবাসের হাতে বাঙালির ঘরের কথাতে পরিণত হয়েছে। কিন্তু বাল্মীকি রামায়ণের মূল কাঠামোটিকে রেখায় রেখায় না হলেও, মূল গল্প কাঠামোটিকে কৃত্তিবাস যথার্থভাবেই অনুসরণ করেছেন। সেই কারণে পাঁচালীকাব্যের কাহিনী গ্রন্থনেও বাল্মীকির উপস্থিতি লক্ষ্য করা যাবে। অনেক জায়গায়— দশরথ কর্তৃক সিন্দুবধ, রামের নির্বাসন ও ভরতমিলন, সীতাহরণে রামের বিলাপ, লক্ষ্মণের শক্তিশেল, সীতার অগ্নি পরীক্ষা, সীতা নির্বাসন, লবকুশ কর্তৃক রামসৈন্যের পরাভব, সীতার পাতাল প্রবেশ, রামের লক্ষ্মণ বর্জন, হনুমানের দাস্য ভক্তি। তা সত্ত্বেও বলা যায়, কৃত্তিবাস আর্য রামায়ণের ব্যাপক ও বিশাল কাহিনির মহাকব্যোচিত বেগ ও গতিশীলতা রক্ষা না করে, মূল কাহিনিকে বহু স্থানেই সঙ্কুচিত করে নিয়েছেন। বাল্মীকির নিসর্গ বর্ণনার মাধুরী নিজ জাতিকুল হারিয়ে বাঙলাদেশের শ্যামলভূমিতে আশ্রয় গ্রহণ করেছে। মহাকাব্যের বিশালতার জায়গায় কৃত্তিবাসের রামায়ণে এসেছে গীতিকাব্যের অন্তর্লীন গভীরতা। বাল্মীকির চরিত্রগুলিকেও কৃত্তিবাস দেশকালের উপযোগী করে নিয়েছেন। অর্থাৎ চরিত্র বিকাশের দিক থেকেও কৃত্তিবাসী রামায়ণ স্বাতন্ত্র্য বিশিষ্ট। কৃত্তিবাসের রামচন্দ্র প্রেমের দেবতা, ভক্তপ্রাণ অশ্রুব্যাকুল, লক্ষ্মণ অপরিণামদর্শী উদ্ধত যুবক, দশরথ অসহায় ক্লীব স্ত্রৈণ, কৈকেয়ী-মন্থরা নীচ স্বার্থকামী, ভরতের মহত্ত্ব ও ত্যাগ রক্তমাংসহীন আদর্শের নিষ্প্রাণতায় সমাচ্ছন্ন: বালী, সুগ্রীব, হনুমানাদি তাদের শ্রেণি স্বভাবের ঊর্ধ্বে উঠতে পারেনি, সীতা

সর্বংসহা কান্তকোমল বঙ্গবধূর মূর্তি মাত্র। রাক্ষসরাজ রাবণ একাধারে বর্বর, দুর্বিনীত, অন্যদিকে অপরিমেয় রামভক্তও বটে।বীরবাহু-তরণী সেন, অহিরাবণ-মহীরাবণ-কেউ ভক্তিরসে, কেউ করুণ রসে আর্দ্র হয়ে বাংলাদেশের প্রকৃতিকেই যেন স্বীকার করে নিয়েছে। কৃত্তিবাসের কাব্য বাঙালির ঘরের কথাকে স্থান দিয়ে বাংলা রামায়ণ হয়ে উঠেছে। শ্রীরাম পাঁচালীর গ্রাম্যগানে, বাংলা পয়ারের ছন্দে পরিণত হয়েছে বাঙালির ভাবাপ্লুত ভক্তিরসে। রূপেও এই রামায়ণ ভারতীয় মহাকাব্য নয়, রসেও তা ভারতীয় কাব্য নয়— রূপেরসে একান্ত বাঙালির কাব্য। কৃত্তিবাসের চরিত্রদর্শে ও চরিত্রাচিত্রণেও তাই আর সেই মহাকাব্যের বলিস্ঠতা নেই, আছে শিল্পীর নিপুণ মাধুর্য।

রাম, সীতা লক্ষ্মণ, দশরথ কিংবা রাবণ, মন্দোদরী, বিভীষণ-বাল্মীকিরপ্রত্যেকটি চরিত্র মহাকাব্যিক আদর্শে পরিকল্পিত। কিন্তু কৃত্তিবাসের হাতে এই মহান চরিত্রগুলোই পরিণত হয়েছে বাঙালির ঘরোয়া আদর্শেরচরিত্রে। কৃত্তিবাসের সীতা যে কোমল লজ্জানম্র বাঙালি কুলবধূ; বাল্মীকি পরিকল্পিত সীতা চরিত্রের সঙ্গে তুলনা করলে তার পরিচয় মেলে। বনবাস যাত্রার পূর্বে রামচন্দ্র স্ত্রী সীতাকে সঙ্গে নিতে অসম্মত হ'লে ক্ষত্রিয়া কন্যা ও বধূ দীপ্ত ক্রোধে বলেছিলেন, ''হে রাম, আমার পিতা মিথিলাপতি জনকরাজ তোমাকে আকৃতিতে পুরুষ ও ব্যবহারে স্ত্রী বলিয়া জানিতেন কি? বোধ হয়, তাহা হইলে তোমার সহিত আমার বিবাহ দিতেন না।'' বাল্মীকির ব্যঙ্গের তির্যকতা কৃত্তিবাসী রামায়ণে তীক্ষ্ণতা হারিয়ে ফেলেছে—

পণ্ডিত হৈয়া বল নির্বোধের প্রায়।
কেনহেন জনে পিতা দিলেন আমায়।।
নিজ নারী রাখিতে যে করে ভয় মনে।
দেখ তারে বীর বলে কোন বীর জনে।।

কৃত্তিবাসের সীতা চরিত্রে নমনীয়, ভীরু দুর্বল। পরিস্থিতির সামনে তাঁর প্রকৃত অবস্থা কৃত্তিবাসের ভাষাতেই যথার্থ চিত্রিত—

'জানকী কাঁপেন যেন কলার বাওড়ী।'

বাল্মীকির যে রাবণ রাক্ষসরাজ, ভয়ংকরস্বভাব, বীর যোদ্ধা; কৃত্তিবাসের হাতে সেই রাবণ রণক্ষেত্রে পতিত হলে, রামচন্দ্রকে 'ব্রহ্ম সনাতন' ও 'অনাদি পুরুষ' জ্ঞানে তাঁর কাছে প্রার্থনা জানিয়ে বলছেন—

মন্তব্য

অনাথের নাথ তুমি পতিতপাবন।
দয়া করি মস্তকেতে দেহ শ্রীচরণ।।
চিরদিন আমি দাস চরণে তোমার।
শাপেতে রাক্ষসকুলে জনম আমার।।

বাল্মীকির সৃষ্ট হনুমান ঋক-সাম-যজুর্বেদে পরম প্রাজ্ঞ। কৃত্তিবাস সেই হনুমানের চরিত্রে বানর স্বভাবকেই গুরুত্ব দিয়েছেন। মেঘনাদের নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে হনুমানের সেই কপিস্বভাব পূর্ণ প্রকাশিত—

হনুমান বীর যেন সিংহের প্রতাপ।
যজ্ঞকুন্ড ভরি তায় করিল প্রস্রাব।।
যজ্ঞকুন্ড উপরেতে হনুমান মুতে।
ফুল ফল যজ্ঞের ভাসিয়া যায় স্রোতে।।

বাল্মীকি ও কৃত্তিবাস সৃষ্ট রামচরিত্রের প্রসঙ্গে ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় যথার্থই বলেছেন যে, ''বাল্মীকির'নরচন্দ্রমা' মানবশ্রেষ্ঠ রাম কৃত্তিবাসে বৈষ্ণব দীনতার মূর্ত প্রতীক, মানব প্রেম, ক্ষমা ও করুণরসের ঘনীভূত নির্যাস এক আত্মবিস্মৃত অবতারত্বে নিজ মানবিক পরিচয় বিসর্জন দিয়াছেন। সমাজজীবন নির্ভর, মানবিকবৃত্তির অকুণ্ঠিত বিকাশে বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস কাহিনি আদর্শলোকের অলৌকিতা প্রধান বাষ্পাকুল ভক্তিশাস্ত্রে রূপান্তরিত হইল'' (বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা ঃ প্রথম খণ্ড)। এইভাবে দেখা যায় গুহক চন্ডালের মিতা রামচন্দ্রের চৈতন্যাদর্শ প্রভাবিত পতিতপাবন রূপটি প্রস্ফুটিত হ'ল। এই বিশেষ কারণেই বাল্মীকির রামের ক্ষাত্র শৌর্যবীর্যের সমস্ত পুরুষতা কোমল অনুভবের স্পর্শে, প্রীতিরসের আতিশয্যে আর্দ্র মূর্তি ধারণ করল। 'সীতাহরণে রামের বিলাপ'-অংশে কৃত্তিবাস এই নরম কোমল আবেগ জর্জর রামকেই উপস্থিত করেছেন-

বিলাপ করেন রাম লক্ষণের আগে।
ভুলিতে না পারি সীতা সদা মনে জাগে।।
কি করিব কোথা যাব অনুজ লক্ষণ।
কোথা গেলে সীতা পাব কর নিরুপণ।।

কৃত্তিবাসের এই রামচরিত্র থেকে অবিমিশ্র ভক্তিবাদ ও জীবনবন্ধন থেকে মুক্তি আকুতির প্রেরণাই প্রধান হয়ে ওঠে। কাব্যধর্মে কৃত্তিবাসের মৌলিকতা সম্পর্কে তাই বলা যায়, কবি আর্য সংস্কৃতির সঙ্গে বাঙালি মানসিকতার সংমিশ্রণে এক অপূর্ব বাংলা মহাকাব্য রচনা করেছেন— যা বাঙালির মনঃ প্রকৃতির অনুকূলে রচিত এক আশ্চর্য সৃষ্টি। ডঃ অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সেই কারণেই বলেছেন, ''গগনস্পর্শী উচ্চ আদর্শ ও প্রতিদিনের পরিচিত জীবনচিত্র, এই দুই রীতি কৃত্তিবাসের রচনায় মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে'' (বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত ঃ প্রথম খণ্ড)। বাল্মীকি রামায়ণের ঔদার্য, বিস্তৃতি, ক্ল্যাসিক গাম্ভীর্যের মহিমা কৃত্তিবাস সযত্নে পরিহার করে সরল পয়ার ছন্দে বাংলাদেশের উপযোগী'শ্রীরাম পাঁচালী' তে পরিণত করেছেন।

৩.৩ কৃত্তিবাসী রামায়ণের চরিত্র বিচার

মহাকবি বাল্মীকি রামায়ণের বিভিন্ন চরিত্রের মধ্যে যে মহৎ জীবনাদর্শের নিখুঁত শিল্পরূপ ফুটিয়ে তুলেছিলেন মধ্যযুগীয় পাঁচালীকার কৃত্তিবাসের হাতে সে জাতীয় চরিত্রচিত্রণ আশা করা যায় না। কৃত্তিবাস বাংলার সমাজজীবনে দাঁড়িয়ে সাধারণ জনমানসের উপযোগী করে চরিত্রগুলিকে গড়েছিলেন। তাতে আর্য রামায়ণের চারিত্র্য-মহিমা ও বৈচিত্র্য না থাকলেও বাঙালির জীবনদর্শ নির্ভুলভাবে প্রতিফলিত হয়েছিল। কৃত্তিবাসের কৃতিত্ব এখানেই।

বাল্মীকি-রামায়ণের রাম-লক্ষণ-ভরত- সুগ্রীব-অঙ্গদ-হনুমান, রাবণ-বিভীষণ-ইন্দ্রজিৎ-কুম্ভকর্ণ কিংবা কৈকেয়ী-মন্থরা-সীতা-তারা-মন্দোদরী প্রত্যেকটি চরিত্র স্বাতন্ত্র্যের দ্বারা চিহ্নিত। তারা সবাই ভালোত্বের একঘেয়ে ভূমিকায় অভিনয় করেনি। জীবনের সহজ ও সমতল পথ থেকে বাল্মীকি চরিত্রগুলিকে উঁচুনীচু, সরল-কুটিল সবরকম মানসিকতার মধ্যে দিয়ে টেনে নিয়ে গেছেন। তাই সত্যবদ্ধ দশরথের অসহায় স্নেহব্যাকুলতা, কৈকেয়ীর নীচু স্বার্থপরতা, রাম-সীতার অসাধারণ সহিষ্ণুতা, লক্ষ্মণের বলিষ্ঠ পৌরুষের বাস্তবতা, ভরতের ত্যাগপূর্ণ চরিত্রমহিমা বা রাবণের অত্যুগ্র দাম্ভিকতা চরিত্রগুলিকে প্রাণবন্ত করে তুলেছে।

কৃত্তিবাসে আঁকা চরিত্রগুলিতে মহাকাব্যিক মহিমা কিংবা অমানুষিক বর্বরতা কোনটাই তেমনভাবে ফোটেনি। আসলে কৃত্তিবাসের আমলে দেশে পাঠান অধিকার কায়েমী হয়ে বসেছিল। গণেশ অল্প কয়েক বছর গৌড়ের সিংহাসনে বসলেও তাঁকে

মন্তব্য

যে কোন পরিবেশের সঙ্গে সমঝোতা করে চলতে হত, তাঁর পুত্র যদুর জালালুদ্দীন হওয়ার ঘটনা থেকেই তা বোঝা যায়। তখন রাষ্ট্র মুসলিম-কবলিত, ভূ-সম্পত্তি বেশির ভাগ ওমরাহদের দখলে, হিন্দুর ধর্ম পীর-গাজী ও সুলতানদের উৎপাতে কোণঠাসা। এরকম সামাজিক অবস্থায় মহাকাব্যের বিশালতা ও চরিত্রের উচ্চতম সমুন্নতি আশা করা যায় না। তাই কৃত্তিবাসী রামায়ণের চরিত্রগুলি কাশী-কোশল-মগধ-বিদিশা ছেড়ে বাঙালীর ঘরের আঙিনায় চলে এসেছে আর অনিবার্যভাবে বাঙালীর জনজীবনের অঙ্গীভূত হয়ে গেছে তাই অনেক চরিত্রই মহত্ত্ব বিসর্জন দিয়ে হীন হয়ে পড়েছে। যেমন মহারাজ দশরথ রামের প্রতি স্নেহান্ধ হয়ে বিশ্বামিত্রের সঙ্গে প্রতারণা করে রাম-লক্ষ্মণের বদলে প্রথমে ভারত-শত্রঘ্নকে দিয়েছিলেন। এ জাতীয় তঞ্চকতা পরাক্রমশালী বীরদশরথের চরিত্রে কালিমা লেপন করেনি কি? আবার রাম লক্ষ্মণ বিশ্বামিত্রের সঙ্গে চলে গেলে 'ভূমিতে পড়িয়া রাজা করেন ক্রন্দন।' এ আচরণ কি রাজোচিত? (দ্রষ্টব্যঃ রসবিচার-করুণরস)। কৃত্তিবাসের হাতে পড়ে প্রবল প্রতাপান্বিত রাজা দশরথ দুর্বল স্ত্রৈণ ও হীনচরিত্রে পরিণত হয়েছেন। আবার তাড়কাকে দেখে বিশ্বামিত্রের মাত্রাছাড়া ভয় এই মহাতপা মুনির চরিত্রকে লঘু ও হাস্যস্পদ করে এমন বিকৃতি ঘটিয়েছে যা বাল্মীকির পক্ষে কল্পনা করাও দুঃসাধ্য (দ্রষ্ট্যঃ রসবিচার হাস্যরস) ছিল।

বাল্মীকির রাম 'নরচন্দ্রমা', মনুষ্যত্বের শ্রেষ্ঠ গুণে ভূষিত। কেননা বাল্মীকি চেয়েছিলেন— 'তুলিব দেবতা করি মানুষেরে মোর ছন্দগানে'। তাই বাল্মীকির কল্পনায় রামচরিত্রে যে গুণগুলি আরোপিত হয়েছিল তা হল—

...'বীর্য কার ক্ষমারে করে না অতিক্রম
কাহার চরিত্র ঘেরি সুকঠিন ধর্মের নিয়ম
ধরেছে সুন্দর কান্তি মাণিক্যের অঙ্গদের মতো,
মহৈশ্বর্যে আছে নম্র, মহাদৈন্যে কে হয়নি নত
সম্পদে কে থাকে ভয়ে, বিপদে কে একান্ত নির্ভীক,
কে পেয়েছে সবচেয়ে, কে দিয়েছে তাহার অধিক,
কে নিয়েছে নিজ শিরে রাজভালে মুকুটের সম
সবিনয়ে সগৌরবে ধরা মাঝে দুঃখ মহত্তম,—

কহ মোরে সর্বদর্শী হে দেবর্ষি তার পুণ্য নাম।”
নারদ কহিলা ধীরে ‘‘অযোধ্যার রঘুপতি রাম’’।
— ‘কাহিনী’, ভাষা ও ছন্দ (রবীন্দ্রনাথ)

বাল্মীকির রাম মনুষ্যত্বের সর্বোত্তম আদর্শের প্রতিভূ হয়েও কতকগুলি নিষ্ঠুর অন্যায় করেছিলেন। বালীহত্যার হীনতা, সীতাবর্জনের কলঙ্ক, শম্বুকবধের অপরাধ তাঁকে স্বীকার করতে হয়েছিল। অবশ্য সীতাবর্জন বা শম্বুকবধ উত্তর কাণ্ডের অন্তর্গত— যেটিকে বাল্মীকির রচনা না বলে প্রক্ষিপ্ত বলে মনে করা হয়। তবে বালীবধ তো বাল্মীকির কল্পনা, রামের যে কাজটিকে কোনো যুক্তিতেই মান যায় না। আবার লঙ্কাযুদ্ধের পরে এত দুঃখে ফিরে-পাওয়া সীতাকে দেখে রাম বললেন—

> তোমার মঙ্গল হোক। তুমি জেনো এই রণ-পরিশ্রম... এ তোমার জন্য করা হয়নি।... তোমার চরিত্রে আমার সন্দেহ হয়েছে, নেত্ররোগীর সামনে যেমন দীপশিখা, আমার পক্ষে তুমি সেইরকম কষ্টকর... এখন আর তোমার প্রতি আমার আসক্তি নেই।... লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন, সুগ্রীব বা রাক্ষস বিভীষণ, যাঁকে ইচ্ছা কর তাঁর কাছে যাও।...

এমন মর্মান্তিক কথা যে রামের মুখ দিয়ে বার হল, তার থেকে বোঝা যায় তিনি তখন মনোবিকারে ভুগছিলেন। তাই সীতাকে দীপশিখার মতো পবিত্র জেনেও তাকে সে-মুহূতে সহ্য করতে পারেননি। তবে শেষবারের মতো সীতা যখন অন্তর্হিতা হলেন তখন তাঁর ধৈর্য্যের বাঁধ ভেঙে পড়ল। তিনি ‘মৈথিলীর জন্য উন্মত্ত’ হলেন, জগৎ শূন্যময় দেখতে লাগলেন, কিছুতেই মনে শান্তি পেলেন না এই ধৈর্যহীন শোকের কারণেই তিনি হয়ে উঠেছেন মানুষ, দেবতার অবতার নয়। তাই মারীচের রাক্ষসী মায়া তাঁকে ভোলাতে পেরেছে। সীতা উদ্ধারের জন্যে তাঁকে এত পরিশ্রম করতে হয়েছে তাঁকে মেনে নিতে হয়েছে বর্ষার বাধা, সমুদ্রের ব্যবধান। সেই একই কারণে বালীকে মেরে সুগ্রীবকে রাজত্ব দিয়ে সংগ্রহ করতে হয়েছে বানর-সেনা। এটাই আদি কবির বাস্তববোধ। তাঁর রাম অতিমানব নন,তাই মানুষের দুঃখ যত মর্মান্তিক হতে পারে তার সবটাই তিনি সম্পূর্ণ ভোগ করেছেন— এমনকি মানুষী অবমাননা থেকেও তিনি রেহাই পাননি।

কৃত্তিবাসের রাম বিষ্ণুর সাক্ষাৎ অবতার। তিনি করুণাময়, পতিতপাবন ও

মন্তব্য

ভক্তগতপ্রাণ। তাঁর পায়ের ছোঁওয়া অহল্যা জীবন ফিরে পায়, তাঁর হাতে নিহত হতে পেরে তরণীসেন, বীরবাহু, অহী ও মহীরাবণ এমনকি স্বয়ং রাবণ পর্যন্ত ধন্য হয়ে যায়। অন্যদিকে তিনি আদর্শ পুত্র, আদর্শ ভাই, আদর্শ স্বামী,আদর্শ রাজা। সীতার অগ্নিপরীক্ষা নিলেও,তপোবন দেখানোর ছলনায় সীতাকে বিসর্জন দিলেও (কৃত্তিবাসের রাম সীতাগতপ্রাণ) আজও বাঙালী পল্লীবালার ব্রতকতায় তিনিই আদর্শ স্বামী। আর রাম রাজত্বের সুখের কথা তো প্রবাদে পরিণত হয়েছে। তবে কৃত্তিবাসী রামের মধ্যে ক্ষাত্রতেজের বদলে অশ্রুপাত প্রবণতা বেশি দেখা যায়, তা সে সীতাবিরহ বা ভক্তবৎসলতা যে কারণেই হোক (দ্রঃ রসবিচার ঃ করুণরস ও ভক্তিরস)।

আর্ষ রামায়ণের সীতাচরিত্রও কৃত্তিবাসের হাতে সদাসহিষ্ণু অশ্রুমুখী কুলবধু হয়ে দাঁড়িয়েছে। বনবাসের সময় রাম সীতাকে সঙ্গে নিতে দ্বিধা করলে এই ক্ষত্রিয়াণী জনকনন্দিনী বলেছিলেন, আমার পিতা তোমাকে আকৃতিতে পুরুষ কিন্তু ব্যবহারে স্ত্রী বলে জানলে বোধহয় তোমার সঙ্গে আমার বিবাহ দিতেন না। সীতার এই উক্তি যে ক্ষুরধার ব্যঙ্গে ঝলসে উঠেছিল, কৃত্তিবাসের সীতার মুখে তার তীক্ষ্ণতা হারিয়ে গেছে।—

‘পণ্ডিত হৈয়া বল নির্বোধের প্রায়।
কে হেন জনে পিতা দিলেন আমায়।।
নিজ নারী রাখিতে যে করে ভয় মনে।
দেখ তারে বীর বলে কোন বীর জনে।।’

সীতাহরণের সময় বাল্মীকির সীতা এই বলে আক্ষেপ করেছেন, যে রাম ধর্ম রক্ষার জন্য প্রাণ, সুখ ও অর্থ সবই ত্যাগ করে থাকেন, সেই তিনি সীতা অধর্ম কর্তৃক অপহৃতা হচ্ছেন দেখেও উপেক্ষা করছেন কেন? শত্রু আপন রাম অবিনয়ীদের শাসনকর্তা। তবে কেন পাপাঙ্ক রাবণকে তিনি শাসন করছেন না? এখানে কৃত্তিবাসের সীতা শুধু অসহায়ের মতো কেঁদে কেঁদে বিলাপ করছেন—

‘ত্রাসেতে কান্দেন সীতা হইয়া কাতর।
কোথা গেলে প্রভুরাম গুরের সাগর।।
সিংহের বিক্রম সম দেবর লক্ষণ।
শূন্য ঘরে পেয়ে মোরে হরিছে রাবণ।।’

এখানে সীতা অস্থিহীন কান্তকোমল বাঙালীনী হয়ে গেছেন। অগ্নিপরীক্ষার আগে রাম যখন সীতার চরিত্র সন্দেহ প্রকাশ করে তাঁকে লক্ষ্মণ-ভরত-শত্রুঘ্ন-সুগ্রীব বা বিভীষণকে বরণ অথবা যা খুশি তাই করার নির্দেশ দিয়ে রূঢ় ভাষায় তাঁকে প্রত্যাখ্যান করলেন তখন ধার্মিক জনকদুহিতা সীতা সতীত্বের গৌরবে এবং পিতৃকুলের মহিমায় দীপ্ত হয়ে ক্ষত্রিয়াণী সুলভ তেজে রামচন্দ্রকে 'প্রাকৃতজন' অর্থাৎ নীচ বা ইতর বলে ভর্ৎসনা করতে দ্বিধা করেননি। কিন্তু কৃত্তিবাসের ব্যক্তিত্বহীনা সীতা রামের কাছে কৈফিয়ত দাখিল করতে বসেন।—

'সবেমাত্র ছুঁইয়াছে পাপিষ্ঠ রাবণ।
ইতর নারীর মত ভাব কি কারণ।।'

লক্ষ্মণের চরিত্রচিত্রণেও বাল্মীকি ও কৃত্তিবাসে এরকম তফাত দেখা গেছে। অযোধ্যাকাণ্ডে রামের প্রতি বনবাসের আজ্ঞায় ক্রুদ্ধ লক্ষ্মণ বলেছেন—

'হনিষ্যে পিতরং কৈকেয্যাসক্তমানসম্...'

অর্থাৎ কৈকেয়ীর প্রতি আসক্ত বৃদ্ধ পিতাকে আমি বধ করব। শুধু পিতা নয়, ভরত এবং কৈকেয়ীকেও লক্ষ্মণ বধ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। এমনিকি রামকে পর্যন্ত লক্ষ্মণ বলেছেন, ধর্মের দ্বারা আপনার বুদ্ধি বিপর্যয় ঘটেছে। এই দুর্ভাষী, দুর্বিনীত ও স্বজনদ্রোহী ভাইকে রাম অনবরত শান্ত ও সংযত করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু কৃত্তিবাস লক্ষ্মণের মধ্যে ভ্রাতৃভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাতে চেয়ে রামের প্রতি তার একান্ত অনুগত ও বশংবদ রূপটি ফুটিয়ে তুলেছেন। অরণ্যকাণ্ডেও বাল্মীকির লক্ষণ সীতার কর্কশ বাক্যে কুপিত হয়ে রামের কাছে চলে যান। কিন্তু কৃত্তিবাস লক্ষ্মণকে সংযত, সহিষ্ণু এবং সীতার প্রতি একান্ত ভক্তিমান করে এঁকেছেন। এইভাবেই বীর্যবান, দৃঢ় চরিত্র দাম্ভিক রাবণ শেষপর্যায়ে কৃত্তিবাসের হাতে রামভক্ত হয়ে উঠেছেন। মুমূর্ষু রাবণ রামকে 'ব্রহ্মসনাতন' ও 'অনাদি পুরুষ' বলে প্রার্থনা করেছে—

'অনাথের নাথ তুমি পতিত পাবন।
দয়া করি মস্তকেতে দেহ শ্রীচরণ।
চিরদিন আমি দাস চরণে তোমার।
শাপেতে রাক্ষসকুলে জনম আমার।'

মন্তব্য

কিন্তু পরস্ত্রী-অপহারক পাপিষ্ঠ রাবণকে হঠাৎ এইভাবে রামভক্ত করে তোলায় চরিত্রটির পূর্বাপর সঙ্গতি বজায় থাকেনি। আবার অসামান্য নৈপুণ্যে দুটি মাত্র উপমার সাহায্যে বাল্মীকি রাবণকে জীবন্ত করে তুলতে পেরেছেন ঃ 'পাপরাশি সদৃশ কৃষ্ণবর্ণ সেই রাক্ষসপতি যেন ভুজঙ্গের ন্যায় নিঃশ্বাস ত্যাগ করিতেছে।' এর সঙ্গে কৃত্তিবাসের বর্ণনা—

'নীলবর্ণ রাবণ যে পীতবস্ত্রধারী।
নবজলধর যেন বিদ্যুৎ সঞ্চারী।'

তুলনা করে দেখলেই বোঝা যায় মহাকাব্যের চরিত্রাঙ্কণে কৃত্তিবাসের অপটুতা।

হনুমানকে বাল্মীকি পরম প্রাজ্ঞ ও বেদজ্ঞ হিসেবে দেখিয়েছেন। কিন্তু কৃত্তিবাস যে হনুমানকে এঁকেছেন তাতে তার বানর স্বভাবটিই বিশেষভাবে প্রকট হয়ে উঠেছে। অনুমান ইন্দ্রজিতের নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে গিয়ে যজ্ঞ নষ্ট করার অভিপ্রায়ে পূজোর আয়োজন অপবিত্র করে দিয়েছে।—

'হনুমান বীর যেন সিংহের প্রতপা।
যজ্ঞকুণ্ড ভরি তায় করিল প্রস্রাব।।
যজ্ঞকুণ্ড উপরেতে হনুমান মুতে।
ফুলফল যজ্ঞের ভাসিয়া যায় স্রোতে।।"

এই রকম অসভ্য আচরণের অমার্জিত বর্ণনা বাল্মীকির কল্পনার অগোচর। সীতার খোঁজে লঙ্কাপুরীতে গিয়ে ঘুমন্ত মন্দোদরীকে সীতা ভেবে উল্লসিত হনুমান যে আচরণ করেছিল বাল্মীকির ভাষায় তা হল মহাবাহু পবননন্দন 'বানর স্বভাব প্রদর্শনপূর্বক এক প্রান্তে গিয়া বাহু আস্ফোটন,পুচ্ছচুম্বন, আনন্দে নৃত্য, বিবিধ ভাবভঙ্গি, গান ও লম্ফপ্রদানপূর্বক স্তম্ভে আরোহন করিয়া পুনর্বার ভূমিতে পতিত হইতে লাগিলেন।' বাল্মীকি এখানে বানর-যূথপতির স্বাভাবিক চাপল্যকে বজায় রেখেও তার মহিমাকে অক্ষুণ্ণ রাখতে পেরেছেন।

বাল্মীকির মহাকাব্য যেমন বিশাল, তাঁর আঁকা চরিত্রগুলিও তেমনি মহিমান্বিত। আবার মনস্তত্ত্ববিচারে এবং ব্যক্তিবৈশিষ্ট্যেও তারা প্রত্যেকে স্বতন্ত্র। কৃত্তিবাসের চরিত্রচিত্রণ সম্পর্কে মনে রাখতে হবে যে কবি তাঁর সমসাময়িক দেশকালের ছায়াকে ছাড়িয়ে উঠতে পারেননি। কোনো কবি এমনকি আত্মমগ্ন গীতিকবিও তা পারেন না।

সুতরাং রামায়ণের মতো আখ্যান কাব্যের চরত্রিচিত্রণে কৃত্তিবাস যে মধ্যযুগীয় বাংলাদেশের জীবন ও চরিত্রাদর্শ গ্রহণ করবেন সেটাই স্বাভাবিক। সপ্তদশ শতকের কবি তুলসীদাসও মধ্যযুগীয় ভারতের আত্মনিবেদনমূলক ভক্তির আদর্শেই তাঁর চরিত্র-পরিকল্পনা করেছিলেন। আসলে সমাজে বাস করে বিশেষ ধরনের সমাজচেতনার মধ্যে বেড়ে ওঠার ফলে শিল্পীর সৃষ্টিতে যে পরিমাণ দেশকালের প্রভাব পড়া সম্ভব কৃত্তিবাসের আঁকা চরিত্রে সেটুকু থেকেছে। তাই সীতা হয়েছেন বাঙালী ঘরের কোমলস্বভাবা কল্যাণী গৃহবধূ, রাম হয়েছেন গৃহচারী বাঙালীর উপযোগী আদর্শ পুত্র, আদর্শ অগ্রজ ও আদর্শ স্বামী, লক্ষ্মণ হয়েছেন আদর্শ অনুজ ও ভক্তিনত দেবর, রাবণ হয়েছে প্রচ্ছন্ন ভক্ত এবং বীরবাহু-তরণীসেন প্রমুখের মধ্যে ভক্তিমিশ্রিত বীররস যে করুণ কোমল অথচ বীর্যবান জীবনাদর্শকে ফুটিয়ে তুলেছে তা বাংলাদেশের নরনারীর জীবনের ছায়াতলেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এইখানেই কৃত্তিবাসের চরিত্রসৃষ্টির সার্থকতা এবং এর ফলেই তাঁর রামায়ণ বাঙালীর জাতীয় কাব্য হয়ে উঠতে পেরেছে।

৩.৪ কৃত্তিবাসী রামায়াণের রস বিচার

করুণরস

প্রাচীন অলংকার শাস্ত্রমতে বীর, করুণ, আদি ও শান্ত এই চারটি রসের যে কোন একটি মহাকাব্যের অঙ্গিরস অর্থাৎ প্রধান রস হতে পারে। আর আমরা সকলেই জানি আদি কবির শোক থেকে উচ্চারিত শ্লোকেই রামায়ণের উদ্‌ভব। তাই করুণ রসই রামায়ণের মুখ্য রস। রামায়ণের আগাগোড়া কাহিনীটিই তো করুণরসের আকর। অযোধ্যাকাণ্ডে বর্ণিত রামের নির্বাসন, অযোধ্যাবাসীর বিলাপ, কৌশল্যার খেদ, দশরথের মৃত্যু থেকে শুরু করে অরণ্যকাণ্ডে সীতাহরণ, রামলক্ষ্মণের বিলাপ, কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে বালীবধে তারার ক্রন্দন, লঙ্কাকাণ্ডে বংশনাশে রাবণের শোক, রাবণের পতনে তার বিধবা পত্নীদের আর্তনাদ, সীতার অগ্নিপ্রবেশ ইত্যাদি কাহিনীতে করুণরসের প্রবাহ বয়ে গেছে। উত্তরাকাণ্ডেও সীতার নির্বাসন, রামের বেদনা, সীতার পাতালপ্রবেশ এবং শেষে তিন ভাইসহ রামের সরযূ নদীতে দেহত্যাগ পর্যন্ত সমস্ত ঘটনাই বেদনার অশ্রুজলে অভিষিক্ত। কৃত্তিবাস এই কাহিনীরই অনুবর্তন করেছেন। কিন্তু মহাকবি ও প্রাদশিক কবির মধ্যে কবিত্ব শক্তির পার্থক্য যত তাঁদের পরিবেশিত করুণরসের অভিব্যক্তিতেও পার্থক্য তত দূর। মহাকবি বল্মীকির করুণরসে যে সংযত মহিমা দেখা

মন্তব্য

গেছে কৃত্তিবাসে সেই সংযম, সেই মহিমা ফোটেনি। তাই তাঁরা রামায়ণে কান্না ও বিলাপের আতিশয্য দেখা গেছে।

আদিকাণ্ডে ঋষি বিশ্বামিত্র যখন রাক্ষস বধের জন্য রাম-লক্ষ্মণকে নিয়ে যাচ্ছেন তখন দশরথ তাঁদের বিদায় দিতে কেঁদেই আকুল।—

'শ্রীরাম লক্ষ্মণে লইয়া বিশ্বামিত্র যান।
মহারাজ নেত্রনীরে ধরণী ভাসান।।
কতদূরে গিয়া রাম হ'ন অদর্শন।
ভূমিতে পড়িয়া রাজা করেন ক্রন্দন।।'

দশরথের মতো বীর্যমান প্রতাপান্বিত রাজার পক্ষে এমন কান্না অশোভন ও অসংগত। রামের অভিষেকের প্রাক্কালে কৈকেয়ীর বর প্রার্থনায় সত্যবদ্ধ দশরথের দুর্দশার যে ছবি কৃত্তিবাস এঁকেছেন তা হল—

'কৈকেয়ীর পায়ে রাজা লোটে ভূমি তলে।
সর্বাঙ্গ তিতিল তাঁর নয়নের জলে।।'

কৃত্তিবাসের রামলক্ষ্মণ পিতার যোগ্য উত্তরাধিকারী। তাই—

'রাজার দুঃখেতে দুঃখী শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
রাজার ক্রন্দনে কাঁদেন ভাই দুইজন।।'

সেইসঙ্গে রামনির্বাসনে রাজধানী অযোধ্যাতেও 'রাত্রিদিন কান্দে লোকে করে জাগরণ।' আবার সীতাহরণের পরে রামের যে বিলাপ তাও চোখের জলে তরল।—

'কান্দিয়া বিকল রাম জলে ভাসে আঁখি
রামের ক্রন্দনে কান্দে বন্য পশুপাখী।'

এরপর বর্ষাসমাগমে রাম মাল্যবান পর্বতে গেলেন। ওখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে অপরূপ। কিন্তু— 'সীতা বিনা সর্বসুখে শ্রীরাম বঞ্চিত' এবং পুরো বর্ষাকাল ধরে— 'সীতা লাগি শ্রীরাম কান্দেন চারিমাস।'

এই প্রসঙ্গে আমরা বাল্মীকি রামায়ণে বর্ণিত বর্ষা ও শরতের ঋতুবিলাস স্মরণ করতে পারি। রামচন্দ্রের 'বনবাসের দুঃখ, সীতা হারানোর দুঃখ, বালীবধর উত্তেজনা

ও অবসাদ— সমস্ত শেষ হয়েছে। সামনে পড়ে আছে মহাযুদ্ধের বীভৎসতা ঃ দুই ব্যস্ততার মাঝখানে একটু শান্তি, সৌন্দর্য-সম্ভোগের বিশুদ্ধ একটু আনন্দ।' এই প্রসঙ্গে কবি-সমালোচক বুদ্ধদেব বসু মন্তব্য করেছেন

মন্তব্য

> এই বিরতির প্রয়োজন ছিলো সকলেরই— কাব্যের, কবির এবং পাঠকের, আর সবচেয়ে বেশি রামের।... বালস্বভাব লক্ষ্মণের সীতা উদ্ধারের চিন্তা ছাড়া আর কিছুতেই মন নেই; শান্ত শুদ্ধশীল রাম তাকে ডেকে এনে দেখাচ্ছেন বর্ষার বৈচিত্র, শরতের শ্রীলতা।... সীতার বিরহে রাম ক্লিষ্ট, কিন্তু অভিভূত নন; যদিও মুখে তিনি দু-চারবার আক্ষেপ করছেন, আসলে সীতার অভাব তাঁর প্রকৃতি-সম্ভোগের অন্তরায় হলো না... সীতা কাছে নেই বলে প্রকৃতির সৌন্দর্যের ওপর অভিমান করলেন না রাম, তার গলা জড়িয়েও কাঁদলেন না; সৌন্দর্যে তাঁর নিষ্কাম নৈর্ব্যক্তিক আনন্দ, যেমন শিল্পীর।
>
> — (প্রবন্ধ সংকলন ১৯৯৬, রামায়ণ)

এর আগে বা পরে নিসর্গ বর্ণনার সুযোগ বাল্মীকির ছিল, কিন্তু কর্মব্যস্ত রামের অবকাশ ছিল না। এখন যুদ্ধ যাত্রার পূর্বাহ্নে রামের একটু অবসর মিলেছে। আসন্ন হৃদয়হীন যুদ্ধের বীভৎসতাকে এবং সীতার চিন্তাকেও দূরে সরিয়ে রেখে তিনি ভ্রমরগুঞ্জন মুখরিত, শিখীর নর্তন সুশোভিত ও গজেন্দ্রর মত্ততায় মন্দ্রিত শ্যামল বনভূমির সৌন্দর্য সম্ভোগে মনপ্রাণ ভরিয়ে তুলছেন। আসলে এখানে বর্ণনার যে কবিত্ব, রামের মুখে এই বর্ণনা বসানোর মধ্যে যে গভীর নাট্যবোধ এবং বিষয়োপযোগী চরিত্রাঙ্কণের মতো উঁচুদরের শিল্পকলা কৃত্তিবাসের মতো কবির কাছে প্রত্যাশিত নয়। সুতরাং সীতাবিরহে কান্না ছাড়া রামের আর কিছু করার থাকে না। তাই—

> 'কান্দিতে কান্দিতে গেল সে শ্রাবণ মাস।
> রামের ক্রন্দনে গীত গায় কৃত্তিবাস।।'

সীতার অগ্নিপরীক্ষার সময়ে প্রজ্বলন্ত অগ্নিকুন্ডের মধ্যে সীতাকে না দেখে কৃত্তিবাসের রামের অবস্থা হল—

মন্তব্য

‘কুণ্ডমধ্যে চাহি তবে সীতারে না দেখি।
ঝরিতে লাগিল তার দুটি পদ্ম-আঁখি।।
দেখেন সংসার শূন্য যেমন পাগল।
ভূমে গড়াগড়ি যান হইয়া বিকল।।’

কৃত্তিবাসের রামেরচরিত্রে বিরচিত ধৈর্য্য-গাম্ভীর্যের নিতান্তই অভাব। তাঁর অধীরতার জন্য তাঁর আচরণ কাপুরুষের মতো বোধ হয়। আবার শুধু রাম নন, রামের প্রতি সহমর্মিতায় উপস্থিত সকলেই কেঁদে ভাসাচ্ছেন।—

‘রমের ক্রন্দনে কাঁদে সর্ব দেবগণ।
কান্দিছে বরুণদেব শমন পবন।।
যত লোকপাল কান্দে দেব পুরন্দর।
জলের ভিতরে থাকি কান্দেন সাগর।।
নল নীল কান্দে আর সুগ্রীব বানর।
জাম্বুবান সুষেণ ও বালির কোঙর।।...
কান্দিতে কান্দিতে রাম ছাড়েন নিশ্বাস।
সীতার পরীক্ষা গীত গায় কৃত্তিবাস।।’

এখানে কান্না অনেক আছে, কিন্তু করুণরসের মর্মস্পর্শী গভীরতা আছে কি? সীতা বিসর্জনের পরেও রামের অশ্রুধারা প্রবহমান।—

‘লক্ষ্মণ বলেন তুমি করিলে বর্জন।
আপনি বর্জিয়া কেন করহ রোদন।।
ক্রন্দন সম্বর প্রভু ক্ষমতা দেহ মনে।...’

এর সঙ্গে বাল্মীকির রামের আচরণ তুলনা করলে কাব্য কিভাবে প্রকৃত করুণ রসসৃষ্টির আধার হয়ে ওঠে তা বোঝা যাবে। সীতার লোকাপবাদ শুনে পর দুঃখিত মহাবীর রামচন্দ্র কেবল সভাসদদের জিজ্ঞাসা করলেন যে সকলেই কি একথা বলে? সকলে তা সমর্থন করলে ধীরপ্রকৃতি রাজা বিনাবাক্যে সভাসদদের বিদায় করলেন এবং তিন ভাইকে ডেকে পাঠালেন। তিনি মুর্ছাও গেলেন না— মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে মাথাও

কুটলেন না। ভাইরা এলে শুধু অশ্রুজল চোখে কিন্তুঅবিচলিত মুখে তাদের জানালেন যে তিনি অন্তরে সীতাকে পবিত্র বলে জানেন— ''অন্তরাত্মা চ মে বেত্তি সীতাং শুদ্ধাং যশস্বিনীম্।'' কিন্তু যেহেতু লোকাপবাদ প্রবল অতএব তিনি সীতাকে ত্যাগ করবেন। তারপর স্থিপ্রতিজ্ঞ রাম লক্ষ্মণকে সীতা বিসর্জনের জন্য আদেশ দিলেন। মন্তব্য

মহাকবি কালিদাসও পত্নীর লোকাপবাদ শোনার পর রামের অবস্থা বর্ণনা করে বলেছেন, এতদিন শত দুঃখেও যে বজ্রকঠিন হৃদয় অটল ছিল সীতার অপযশ রূপ হাতুড়ির গায়ে সেই হৃদয় তপ্ত লোহার মতো বিদীর্ণ হল। এখানে কালিদাস রামকে বৈদেহীবন্ধু' বলে উল্লেখ করেছেন। যে যার হৃদয় বেঁধে রাখে সে তার বন্ধু। তাই রাম রঘুকুলের গৌরব, তিনি প্রজারঞ্জক, কিন্তু অন্তরের অন্তঃস্থলে তিনি 'বেদেহীবন্ধু'। কালিদাস রামকে এই বিশেষণে ভূষিত করেছেন এবং তাঁর শোকের গভীরতার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন, যিনি অধীর হয়ে বিলাপ না করে সংযতচিত্তে সীতাত্যাগের সিদ্ধান্ত নিলেন।

সীতাবিসর্জনের বারো বছর পরেও রামের মনের অবস্থাকে ব্যক্ত করে ভবভূতি তাঁর উত্তরচরিত নাটকে বলেছেন— 'পুটপাক-প্রতীকাশো রামস্য করুণো রসঃ'। ছিদ্রহীন লৌহপাত্রে জল উত্তপ্ত হলে তার বাষ্প বাইরে আসতে পারে না, যত তপ্তই হোক তা অভ্যন্তরেই থেকে যায়, রামের মর্মস্থলও তেমনি অবরুদ্ধ সন্তাপে দগ্ধ হয়েছে। তার কোনো বহিঃপ্রকাশ দেখা যায়নি। এইসব মহাকবিদের লেখনীতে শোকের অন্তহীন দাহ ও বিষাদের স্তব্ধ গাম্ভীর্য যে করুণরস সৃষ্টি করেছে কৃত্তিবাস তার ধারে কাছে পৌঁছতে পারেননি। কান্না ছাড়া করুণরস সৃষ্টির আর কোনো উপকরণ তাঁর হাতে ছিল না। তাই সীতার পাতাল প্রবেশও শোনা গেল—

'অযোধ্যার নগরে হেথা উঠিল ক্রন্দন।।
শ্রীরামের ক্রন্দন হৈল অনিবার।
হাহাকার শব্দ করে সকল সংসার।।'

সুতরাং কৃত্তিবাসী রামায়ণে বহু দুঃখজনক ঘটনা এবং তার জন্য বিলাপের হাহাকার যথেষ্ট থাকলেও যথার্থ করুণরস সৃষ্টি হয়েছে কিনা তাতে সংশয় থেকে যায়।

বীররস

বীররস সৃষ্টিতে ফুলিয়ার ব্রাহ্মণ কবি কৃত্তিবাস তেমন সফল হতে পারেনি। বাল্মীকির

মন্তব্য

সঙ্গে তুলনা করলেই বিষয়টি ভালো বোঝা যাবে। বীররস ও রৌদ্ররস সৃষ্টিতে বাল্মীকির যুদ্ধকাণ্ডই শ্রেষ্ঠ। তবে অরণ্যকাণ্ডের যুদ্ধ বর্ণনাও যথেষ্ট উত্তেজক। বিরোধ বিশেষ করে খরের সঙ্গে রামের যুদ্ধ বর্ণনায় পরস্পরের আক্রমণ ও প্রতি আক্রমণের প্রতিটি স্তর নিখুঁতভাবে বর্ণিত হয়েছে। তুলনায় কৃত্তিবাসের বর্ণনা অনেক নিষ্প্রভ।—

'হাতে অস্ত্র নাহি আর উঠি দিল রড়।
রামেরে রুষিয়া যায় খাইতে কামড়।।'

এই জাতীয় বর্ণনায় যুদ্ধজনিত বীররসের সৃস্টি হয় না।

যুদ্ধের অতিবিস্তারিত ও ক্রমোত্তেজক বর্ণনায় বাল্মীকির যুদ্ধকাণ্ড অতুলনীয়। দৈহিক বিক্রম, অস্ত্রচালনা, আক্রমণ-প্রতি-আক্রমণ পদ্ধতি ইত্যাদির সঙ্গে উদ্দীপনা, ক্রোধ, হিংসা, ঘৃণা প্রভৃতি মানসিক ভাবের উত্তপ্ত অভিব্যক্তিতে বাল্মীকির সঙ্গে কৃত্তিবাসের তুলনা চলে না। প্রচণ্ডতা ও ভয়াবহতার দিক দিয়ে রাম-রাবণের অন্তিম যুদ্ধই সবচেয়ে উত্তেজনাজনক। ৯৯ থেকে ১০৮ সর্গ পর্যন্ত এই ভীষণ যুদ্ধের একটানা বর্ণনা ধীরে ধীরে সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছেছে। এই ভয়ংকর দ্বৈরথ যুদ্ধ স্বর্গ মর্ত্যপাতাল ব্যাপী এক ভয়ংকর আলোড়ন জাগিয়েছিল। এই মূল যুদ্ধ ছাড়া লক্ষ্মণ-ইন্দ্রজিৎ এব রাম-কুম্ভকর্ণ যুদ্ধও যথেষ্ট উত্তেজক। অবশ্য কুম্ভকর্ণের যুদ্ধ ও পতন খানিকটা বীভৎস রসের সঞ্চার করেছে।

কৃত্তিবাসের যুদ্ধ বর্ণনা অনেকটাই নিরুত্তাপ ও উত্তেজনাহীন। অবশ্য বাহুযুদ্ধের চেয়ে বাগযুদ্ধেই কৃত্তিবাসের দাপট অনেক বেশি। হনুমান-মেঘনাদের বাগ্‌যুদ্ধ বা অঙ্গদের রায়বার তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। যুদ্ধ বর্ণনায় বাঙালী কবি তাঁর সীমিত অভিজ্ঞতা নিয়ে যখন লেখেন—

'অশ্বকর্ণ বৃক্ষ ধরে দিল তিন পাক।
বায়ুবেগে ঘুরে যেন কুমোরের চাক।।' (লঙ্কাকাণ্ড)

তখন তাকে বীররস সৃষ্ট হয় না।

আসলে কৃত্তিবাস রামায়ণ রচনা করেছিলেন সাধারণ শ্রোতাদের জন্যে যাদের কল্পনাশক্তি ও রসবোধ নিতান্তই খাটো মাপের। যুদ্ধ সম্বন্ধে তাদের কোনো প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছিল

না, তাদের পাঁচালীকারেরও সে অভিজ্ঞতার একান্ত অভাব। অতএব কবি কৃত্তিবাস লঙ্কাকাণ্ডে মৌখিক আস্ফালনের মধ্যেই যুদ্ধের ভয়াবহতাকে সীমাবদ্ধ রেখে বাঙালী শ্রোতাদের উত্তেজনার আগুন পোয়ানোর ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। তাই কৃত্তিবাসের বীররসের বর্ণনা নেহাৎই যাত্রাদলের কৃত্রিম যুদ্ধে পরিরত হয়েছে। সবচেয়ে মারাত্মক হয়েছে লঙ্কাকাণ্ডে ভক্তিরসের অনধিকার প্রবেশ। রাবণ থেকে শুরু করে বীরবাহু, তরণীসেন সকলেই কেউ প্রচ্ছন্নভাবে কেউ বা প্রকাশ্যভাবে রামভক্ত। মুক্তিলাভের আশায় তারা স্বেচ্ছায় রামের হাতে প্রাণ দিতে এসেছে। ফলে ভক্তবৎসল রামের পক্ষে সংকট ঘনিয়েছে— কিভাবে তিনি এমন ভক্তের প্রাণ সংহার করবেন। সুতরাং লঙ্কাকাণ্ডে সামরিক পরিবেশটাই ভক্তিরসে আর্দ্র হয়ে গিয়ে রৌদ্ররসের উত্তেজনা প্রশমিত হয়ে গেছে।

সংস্কৃত শব্দ ও বাক্যের ধ্বনিময় ওজস্বিতা বাল্মীকির বীররসকে প্রাণবন্ত করে তুলেছে। আর শব্দাড়ম্বর ও অলংকারের অভাবে কৃত্তিবাসের সাদামাটা যুদ্ধ বর্ণনা অনেকটা নিষ্প্রাণ হয়ে গেছে।

ভক্তিরস

মূল বাল্মীকি রামায়ণের বালকাণ্ডে বিষ্ণুর চার-অংশে জন্মগ্রহণ বর্ণনায় সামান্য বৈষ্ণবীয় ভক্তিভাবের প্রভাব দেখা যায়। তবে বৈষ্ণব প্রভাব বলার চেয়ে একে বিষ্ণুর প্রভাব বলাই সঙ্গত। অবশ্য এই বিষ্ণুপ্রভাব বালকাণ্ড ও উত্তরকাণ্ডেই দেখালাম। যে দুই কাণ্ডকে পণ্ডিতেরা অনেকে বাল্মীকির রসোবশের স্বীবার করেন না। অন্তত তাতে যে প্রচুর হস্তক্ষেপ ঘটেছে, তা মানতেই হয়। যাইহোক বাল্মীকি বালকাণ্ডও শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি ভক্তি নিবেদন করলেও কৃত্তিবাসী রামায়ণে ভক্ত-ভগবানের মধ্যে যে প্রগাঢ় অনুরাগ দেখা গেছে সেই জাতীয় আবেগ-ব্যাকুল ভক্তিভাবের বাড়াবাড়ি বাল্মীকিতে দেখা যায়নি।

কৃত্তিবাসী রামায়াণে ভক্তিবাদের দুটি ধারা দেখা যায়। একটি নামাশ্রয়ী রাম ভক্তিবাদ, অন্যটি রামচন্দ্রের প্রতি দেবী চণ্ডীর বাৎসল্যভাব। নামতত্ত্ব যা গৌড়ী বৈষ্ণব ধর্মের প্রধান অঙ্গ বলে বিবেচিত (হরের্ণামৈব কেবলম্) তা কিন্তু কৃত্তিবাসেরও আগে থেকে এদেশে প্রচলিত ছিল। অধ্যাত্ম রামায়ণ বা অদ্ভুত রামায়ণে তার নিদর্শন পাই। কৃত্তিবাসী রামায়ণের আদিকাণ্ডে রত্নাকর দস্যু যে রামনাম উচ্চারণ করতে না পারলেও

মন্তব্য

শুধু 'মরা মরা' জপ করেই উদ্ধার পেল, অধ্যাত্ম রামায়ণেও সে নামতত্ত্ব পাওয়া যায়।—

'ইত্যুক্ত্বা রাম তে নাম বাত্যস্তাক্ষরপূর্বকম্।
একাগ্রমন মাত্রৈব মরেতি জপ সর্বদা।।'

এই রামনামের মাহাত্ম দশরথ ও অন্ধকমুনির বিবরণেও কীর্তিত হয়েছে। দশরথ ভুল করে অন্ধক মুনির ছেলেকে শব্দভেদী বাণে বধ করে ফেলার পর পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য বশিষ্ঠপুত্র বামদেবের শরণাপন্ন হয়। বামদেব দশরথের পাপ স্খালনের জন্য তাঁকে তিনবার রামনাম জপ করান এবং দশরথ মহাপাতক থেকে মুক্তি পান। কিন্তু বশিষ্ট তাঁর পুত্রের অজ্ঞতার জন্য মর্মান্তিক ক্রুদ্ধ হয়ে অভিশাপ দেন।—

'এক রামনামে কোটি ব্রহ্মহত্যা হরে।
তিনবার রাম নাম বলালি রাজারে।।
মোর পুত্র হয়ে তোর অজ্ঞান বিশাল
দূর হ'রে বামদেব হবি যে চণ্ডাল।।'

পিতৃশাপে বামদেব শেষে গুহক চণ্ডাল হয়ে জন্ম নেন। কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডেও কারণে অকারণে তাঁকে রামনামের মহিমা কীর্তন করতে দেখা যায়।—

'রাম নাম জপ ভাই অন্য কর্ম পিছে।
সর্ব ধর্ম কর্ম রাম নাম বিনা মিছে।।'

এমন জপের মহিমা তিনি বার বার ব্যক্ত করেছেন।—

'রামনাম লৈতে ভাই না করিও হেলা।
সংসার তরিতে রাম-নামে বান্ধ ভেলা।।
রামনাম স্মরি যেবা মহারণ্যে যায়।
ধনুর্বাণ লয়ে রাম পশ্চাতে গোড়ায়।।'

অবশ্য রামতত্ত্ব কৃত্তিবাসের আবিষ্কার নয়। ১২শ শতকের লীলাশুক (বিল্বমঙ্গল)-র রচিত 'কৃষ্ণকর্ণামৃতে' নামতত্ত্বের আভাস আছে, আর ওই গ্রন্থ বাংলাদেশে অজ্ঞাত বা অপ্রচলিত ছিল না। লঙ্কাকাণ্ডেই এই ভক্তির চূড়ান্ত রূপ দেখা যায়। রামের সঙ্গে যাত্রায় বিভীষণ-পুত্র তরণীসেনের সমরসজ্জার যে বর্ণনা কৃত্তিবাস দিয়েছেন তা হল।—

‘অঙ্গে লেখা রামনাম রথ-চারিপাশে।
তরুণীর ভক্তি দেখি কপিগণ হাসে।।’

ভক্তবৎসল রামের চিন্তা এমন ভক্তের গায়ে কি করে অস্ত্রাঘাত করবেন?

‘কার্যনাই সীতায় না যাইব রাজ্যেতে।
কেমনে মারিব বাণ ভক্তের অঙ্গেতে।।
কন্টক ফুটিলে মম ভক্তের শরীরে।
শেলের সমাজ বাজে আমার অন্তরে।।’

কিন্তু রামের হাতে মৃত্যুবরণ করে স্বর্গে যাওয়ার জন্যেই যে তরুণীর যুদ্ধে আসা। তরুণীর ভক্তি এত বেশি যে মুণ্ড কাটা যাওয়ার পরেও তার মুখে রামনাম উচ্চারিত হতে থাকে।—

‘দুই খণ্ড হয়ে বীর পড়ে ভূমিতলে।
তরুণীর কাটা মুণ্ড রামনাম বলে।।’

রামভক্ত বীরবাহু তো নিজেই বৈষ্ণব অস্ত্র দিয়ে তাঁকে নিধন করার কথা বলেছেন।—

‘জানিলাম রাম তুমি বিষ্ণু অবতার।
অগতির গতি তুমি সংসারের সার।।
শ্রীচরণে অধীনের এই নিবেদন।
বৈষ্ণব অস্ত্রেতে মোরে করহ নিধন।।’

রাবণের যুদ্ধ যাত্রার সময়ে অশুভ লক্ষণ দেখে মন্দোদরী বিলাপ করলে রাবণ তাঁকে এই বলে আশ্বাস দেন।

‘মরিব রামের হাতে ভাগ্যে যদি আছে।
যমের না হবে সাধ্য ঘনাইতে কাছে।।
বিষ্ণুদূর লয়ে যাবে তুলিয়া বিমানে।
সমান প্রতাপে যাব জীবনে মরণে।।’

যুদ্ধের সময়ে অনুতপ্ত রাবণ রামের স্তুতি করলে রাম ব্যাকুল হয়ে ভাবতে থাকেন—

‘কেমনে এমন ভক্তে করিব সংহার।

বিশ্বে কেহ রামানাম না লইবে আয়।।'

শেষ যুদ্ধক্ষেত্রে রাবণের পতন হতে মুমূর্ষু রাবণকে রাম দর্শন দিলেন এবং রাবণ তাঁর মধ্যে ব্রহ্ম সনাতনকে প্রত্যক্ষ করে ধন্য হলেন।—

অনাথের নাথ তুমি পতিত পাবন।

দয়া করে মস্তকেতে দেহ শ্রীচরণ।।

চিরদিন আমি দাস চরণে তোমার।

পাপেতে রাক্ষসকূলে জনম আমার।।'

এই ভক্তি বাঙালীর জীবনের সাধনায় এমনকি তার অস্থিমজ্জায় পরতে পরতে জড়িয়ে আছে।মনে রাখতে হবে কৃত্তিবাসের এই ভক্তের ভগবান রাম স্বয়ং বিষ্ণু, অবতার রূপে যিনি পৃথিবীতে অবতীর্ণ। তিনি বাল্মীকির 'নরচন্দ্রমা' অর্থাৎ নরশ্রেষ্ঠ নন।

লঙ্কাকাণ্ডেই রামনামের মহিমা আর এক ভাবেও প্রচারিত। লঙ্কাযুদ্ধে বানরদের সদ্‌গতি হল না, অথচ রাক্ষসেরা মুক্তি পেল দেখে রামচন্দ্র ইন্দ্রকে তার কারণ জিজ্ঞেস করলে ইন্দ্র বলেন—

'রাবণেরে মার বলি কপিগণ মরে।

উদ্ধার পাইবে বল কি নামের জোরে।।

রামে মার শব্দ করে মরেছে রাক্ষস।

রামনাম করে মরে গেছে স্বর্গবাস।।'

রামনামের এমই মহিমা। এই প্রসঙ্গে হনুমানের দাস্যভক্তির কথাটিও উল্লেখযোগ্য। রামে সমর্পিতপ্রাণ হনুমান তাই বলে—

'তুমিই আশ্রয় মোর ওহে দয়ারাম।

তোমারি চরণে মোর মতি অবিরাম।।

দুর্বল হনুর তুমি একমাত্র বল।

তোমা বিনা নাহি কিছু হনুর সম্বল।।...

রাম হনুমৎ প্রভু হনু রামদাস।

থাকুক সর্বদা এই হনুর বিশ্বাস।।'

এই দাস্যভক্তি পরবর্তী কালে বাংলাদেশে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে গিয়েছিল। তখন ভক্ত ও ভগবানের সম্পর্কটি নিছক প্রভু ভৃত্যের সম্পর্ক হয়ে থাকেনি। হনুমান তার প্রভু রামচন্দ্রকে যে সেবা করেছে তা কোনো কিছুর প্রলোভনে নয়। নিঃস্বার্থবাবে ভালোবেসে প্রভুর উদ্দেশ্যে নিজের সেবাকে সে উৎসর্গ করেছিল। পরবর্তীকালে যে বৈষ্ণবীয় দাস্যভক্তি দেখা গেছে তার উৎস হয়তো এখানেই নিহিত ছিল।

আসলে বাংলাদেশে পঞ্চদশ শতাব্দীর পূর্ব থেকেই প্রচ্ছন্নভাবে ভক্তির স্রোত বয়ে চলেছিল। একদিকে শাক্ত আর একদিকে বৈষ্ণব এই দু'রকম ভক্তিরস বাঙালীর স্বাভাবিক চিত্তধর্মের সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছিল। তার ওপর বাংলার কোমল মাটির সন্তান স্বভাবত ভাবপ্রবণ। আর বাঙলার জাতীয় কবি কৃত্তিবাস বাঙালী চিত্তের এই প্রবণতার উপযোগী করে তাঁর কাব্যে ভক্তিরসের প্লাবন বইয়ে দিয়েছিলেন। তবে এই ভক্তিরস কৃত্তিবাসের মৌলিক আবিষ্কার নয়। মন্দোদরী, রাবণ, কুম্ভকর্ণ, বিভীষণ, কালনেমি-প্রমুখ রাক্ষসেরা যে আসলে প্রচ্ছন্ন রামভক্ত তা রামকথাযুক্ত নানা পুরাণে কিংবা অধ্যাত্ম, যোগবাশিষ্ঠ ইত্যাদি রামায়ণে উল্লেখিত আছে। অধ্যাত্ম-রামায়ণে আছে রাবণ যখন জানতে পারলেন যে বিষ্ণুর হাতে নিহত হলে অন্তিম মোক্ষ অনিবার্য তখন বিষ্ণু-অবতার রামের হাতে হত হবার জন্যেই তিনি স্বেচ্ছায় সীতাকে হরণ করেন। কৃত্তিবাস সম্ভবত ওই সমস্ত উৎস থেকেই তাঁর রামায়ণে এই রাম ভক্তিবাদের অবতারণা করেছিলেন। তাঁর কাব্যে বর্ণিত দুর্গোৎসব ও কালিকা স্তুতিও শ্রোতাদের ভক্তিভাব চরিতার্থ করার জন্যেই রচিত হয়েছিল।

হাস্যরস

ভক্তিরসের মতো হাস্যরস সৃষ্টিতেও কৃত্তিবাসের কৃতিত্ব তর্কাতীত। বাঙালী মনের রুচি ও রসগ্রাহিতার উপযোগী করে তিনি রামাযণ রচনা করেছিলেন। কৃত্তিবাসের কালে বাঙালী সমাজ তেমন রুচিবাগীশ বা শিক্ষাভিমানী ছিল না। তাই স্থূল, গ্রাম্য এবং কিছু পরিমাণে অশ্লীল হাসি উপভোগে তার বাধা ঘটেনি। কৃত্তিবাস তথা রামায়ণ গায়েন বা কথকদের উদ্দেশ্যই ছিল বাঙালী জনমানসের মনোরঞ্জন। তাই কৃত্তিবাস-পরিবেশিত হাস্যরস কখনও রঙ্গব্যঙ্গে শাণিত, কখনও বাক্‌চাতুর্যে উজ্জ্বল, তবে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই উদ্‌ভট কৌতুকে উচ্ছ্বসিত, যা মাঝে মাঝে ভাঁড়ামির পর্যায়ে পৌঁছে গেছে।

মন্তব্য

আদিকাণ্ড থেকেই কৃত্তিবাস হাস্যরসের স্রোতকে মুক্ত করে দিতে চেয়েছেন এবং তার জন্যে মহাতপামুনির চরিত্রবিকৃতি ঘটাতেও তাঁর দ্বিধা হয়নি। তাড়কা রাক্ষসীকে নিধন করার জন্যে বিশ্বামিত্র রাম লক্ষ্মণ দুই ভাইকে দশরথের কাছ থেকে নিয়ে এসেছেন। এই তাড়কাকে দেখে বিশ্বামিত্রের অতিমাত্রায় আতঙ্কিত হবার বর্ণনা দিয়ে কবি কৌতুকরস উদ্রেক করতে চেয়েছেন।

'উভয় ভ্রাতার মধ্যে থাকি মুনিবর।
দূর হৈতে দেখালেন তাড়কার ঘর।।
কর বাড়াইয়া তার ঘর দেখাইয়া।
অতি ত্রাসে মুনিবর যান পলাইয়া।।'

বিশ্বামিত্র চরিত্রের এমন হীন বিকৃতি বাল্মীকির পক্ষে কল্পনা করাও সম্ভব ছিল না।

সীতার বিবাহসভায় হরধনু ভাঙার ব্যাপারেও কৃত্তিবাস কৌতুকরস সৃষ্টির চেষ্টা করেছেন। হরধনু ভাঙতে এসে রাবণ কিভাবে নাকাল হচ্ছে কৃত্তিবাস তার সরস বিবরণ দিয়েছেন।—

'দ্বারেতে দাঁড়ায়ে বীর উঁকি দিয়া চায়।
দেখিয়া দুর্জয় ধনু অন্তরে ডরায়।...
আঁটিয়া কাপড় বীর বান্ধিল কাঁকালে।
কুড়ি হস্তে ধরিল সে ধনু মহাবলে।।
আঁকাড়ি করিয়া সে ধনুকখানি টানে।
তুলিতে না পারে আর চায় চারিপান।।'

এইভাবে বারবার তিনবার রাবণ ধনুক তোলার চেষ্টা করেও পারল না। তখন—

'কাঁকালেতে হাত দিয়া আকাশ নিরখে।
মনে ভাবে পাছে আসি ইন্দ্র বেটা দেখে।।'

শেষপর্যন্ত রণে ভঙ্গ দিয়া তার পলায়ন এবং মিথিলায় 'সকল বালক দেয় তারে টিটকারী।।'

আমরা যাকে পছন্দ করি না তার লাঞ্ছনা আমরা উপভোগ করি। তাই রাবণের

দুর্দশায় শ্রোতা খুশী হয়। এখানে কৌতুক বিশুদ্ধ নয়, আমাদের সংস্কার, আমাদের ন্যায়নীতিবোধই এখানে পরিতৃপ্ত হয়েছে। কিষ্কিন্ধ্যা এবং উত্তরাকাণ্ডে বর্ণিত বালীর রাবণকে নাকাল করার বিবরণ অনুরূপভাবেই শ্রোতাদের কাছে পরম উপভোগ্য হয়ে উঠেছে। অঙ্গদের রায়বারে দেখি এই প্রসঙ্গ তুলে বালীনন্দন রাবণকে খোঁটা দিতে ছাড়েনি।

অযোধ্যাকাণ্ডে কুঁজীর লাঞ্ছনাও দর্শন-শ্রোতারা চিরকাল পরম প্রসন্নতায় উপভোগ করেছেন। মন্থরা না হয়ে অন্য কেউ এমন দূরবস্থায় পড়লে আমাদের সহানুভূতি জাগত নিশ্চয়। ঠিক এই কারণেই অরণ্যকাণ্ডে শূর্পণখার নাক কান কাটার যন্ত্রণায় আমাদের সমবেদনা জাগে না। বিধবা শূর্পণখার এই অনুচিত প্রণয় কবির রঙ্গব্যঙ্গের খোরাক হয় মাত্র। সুন্দরকাণ্ডে লঙ্কাদাহনের সময় রাক্ষস বধূরা আত্মরক্ষার তাগিদে জলে ডুবে মুখটা ভাসিয়ে রাখে। তখন হনুমান 'লেজের অগ্নিতে তার পোড়ায় কুন্তল আর অগ্নিতে পোড়ায় মুখ দেখিতে কৌতুক'। শ্রোতাদের এবং হনুমানের কাছে এটা কৌতুকাবহ হলেও রক্ষোরমণীদের কাছে এটা নিশ্চয় কৌতুক ছিল না। তবু তাদের দুঃখে আমরা সমবেদনায় আর্দ্র হই না, বরং প্রতিহিংসার আনন্দ উপভোগ করি।

বিবাহবাসরে রঙ্গরসিকতা বাঙালীর চিরাচরিত প্রথা। বাঙালী সমাজে ঠাট্টা রসিকতার যে বিশিষ্ট ভাষা ও ভঙ্গি আছে তার হুবহু প্রতফলন দেখি কৃত্তিবাসী রামায়ণে। বিয়ের পরে রামসীতাকে বাসরঘরে বসিয়ে জনকপুরীর অন্তঃপুরিকারা রামের সঙ্গে পরিহাস করতে থাকেন—

'এই কথা রাম হে, তোমাকে কহি ভাল।
সীতা বড় সুন্দরী তুমি বড় কাল।।'

রামের মুখে শোনা যায় তার যোগ্য জবাব।—

'হাসিয়াবলেন রাম সবার গোচর।
সুন্দরীর সহবাসে হইব সুন্দর।।'

সুন্দরকাণ্ডে দেখি রাবণের অনুচরেরা অশোকবন ভাঙার জন্যে হনুমানকে বেঁধে ফেলল। তাতে হনুমানের ভ্রুক্ষেপ নেই। সে নিজের দেহকে সত্তর যোজন বড় করে পড়ে থেকে ধুয়ো তুলল— 'রাজ সম্ভাষণে যাব কান্ধে কর আমা'।

মন্তব্য

দু'লক্ষ রাক্ষস তাকে কাঁধে তুলে বয়ে বয়ে যেতে হিমসিম খেল। কিন্তু প্রতিদানে হনুমান যা করল তা অবর্ণনীয়।—

'মনে মনে হাসে তবে পবনকুমারে।
প্রস্রাব করিয়া দিল কান্ধের উপরে।।'

গ্রাম্য শ্রোতারা স্থূল ও অশ্লীল রসিকতায় আমোদ পেত বেশি। বর্ণনা যত অশ্লীল হাসির প্রচণ্ডতা ততো বেশি, আর কৃত্তিবাসের রচনাও তো এই পল্লীসমাজের বিনোদনের জন্যেই।

রাবণের কাছে পৌঁছে হনুমান পিছন ফিরে বসল। সে তাকে রাজা বলেস্বীকার করতে নারাজ। সেই সঙ্গে রাবণ কোন কোন যুদ্ধে হেরে জব্দ হয়েছে তারও ফিরিস্তি দিতে বসে। তবে রাক্ষস হলেও রাবণের রসবোধ যথেষ্ট। সে রাগ না করে হাসতে থাকে। এদিকে বন্দী হনুমানকে দেখতে এসে রাক্ষসীরা তাকে নিয়ে পরিহাস করতে শুরু করে— 'ফুলের মালায় তুমি ভুবন মোহন।' নারীদের মধ্যে হনুর রসিকতা খোলে ভালো। সে সঙ্গে সঙ্গে সরস কথায় জবাব দিয়ে বলে যে রাবণ তাকে জামাই করার জন্য বেঁধে এনেছে, সে কুলীন, রাবণ মৌলিক। সুতরাং এই বিয়ে রাজযোটক। এই বিয়ে হলে সে মন্দোদরীর মত সুন্দরী শাশুড়ী এবং ইন্দ্রজিতের মতো শ্যালক পাবে। সেই সঙ্গে—

'প্রমীলা শালাজ পাব পরম রূপসী।
রসরঙ্গে তার সঙ্গে রব দিবানিশি।।"

বাঙালীর বৈবাহিক রসিকতা বাসরঘর ছেড়ে লঙ্কায় গিয়ে হাজির হয়েছে। আবার বানরের মুখে মানুষের এই বিবাহ প্রথার বর্ণনা আরও কৌতুককর হয়ে উঠেছে। রক্ষোনারীরাও রসিকতায় কম যায় না। তাদের অনুরোধ— 'ঠাকুরজামাই হলে নাচ তো এখন।' হনুমানও উত্তর দিতে ছাড়ে না—

'দণ্ড দুই থাক নারীগণ।
কত নাচ দেখাইব কে করে গণন।'

হনুমান রায়বারে তরল পরিহাস, সরস রঙ্গরস। কিন্তু অঙগদ রায়বারে তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ বিদ্রূপের উগ্র জ্বালা ফুটে উঠেছে। মহাবীর বালীনন্দনকে ডেকে—

‘শ্রীরাম বলেন শুন, হে অঙ্গদ বলী।
রাবণ রাজারে কিছু দিয়া সে গালি।’

রামের এই আদেশে থেকে মহাবীর অঙ্গদের দৈহিক পরাক্রমের পরিচয় পাওয়া না গেলেও বাগ্‌যুদ্ধে তার পটুত্বের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। অঙ্গদের ভয়ে রাবণ ও তার সভাসদেরা শত শত রাবণমূর্তি ধারণ করে অঙ্গদকে ছলনা করতে চাইলে যুবরাজ যে বিদ্রূপাত্মক ভাষায় রাবণ ও ইন্দ্রজিৎকে গালিগালাজ করেছে তা অশালীন হলেও তাতে বাক্‌চাতুর্যের অভাব নেই—

‘অঙ্গদ বলে, সত্য করি কওরে ইন্দ্রজিতা।
যত বসিয়াছে, সবাই কি তোর পিতা।।
ধনয নারী মন্দোদরী ধন্যরে তোর মাকে।
এক যুবতী শতেক পতি ভাব কেমনে রাখে।।’

রাবণ-অঙ্গদের এই বাগ্‌যুদ্ধ কলহরসিক বাঙালির কাছে পরম উপাদেয় ছিল। রাবণ অঙ্গদকে তার মা কুলটা বলে গাল দিলে অঙ্গদ তার যোগ্য জবাব দিয়েছে। এই ধরনের সরস উক্তি-প্রত্যুক্তি, পরস্পরের প্রতি দোষারোপ, শ্রোতাদের পরম উপভোগের বস্তু হয়ে উঠত। ভাষা যত কটু ও ঝাঁঝালো শ্রোতাদের আমোদও ততো বেশি। প্রথমে শ্লেষবিদ্রূপের লড়াই, তারপর ক্রোধের সঞ্চার যার পরিণতি গালিগালাজে।

অতিরঞ্জন হাসির একটা বড়ো উপাদান। বিকটাকৃতি কুম্ভকর্ণের আচরণে অসংগত রকমের বাড়াবাড়িতে শ্রোতারা না হেসে পারত না। তার ‘নাকের নিশ্বাস যেন প্রলয় পবন’ এবং তার শ্বাস-প্রশ্বাসের ঝড়ে রাক্ষসেরা কখনও উড়ে যায়, কখনও নাকে ঢুকে যায়। আর—

‘অঙ্গ ভঙ্গে আলস্যে যখন তুলে হাই।
মুখের গহ্বর যেন বড় গড়খাই।।’

এই কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গের উৎকট আয়োজনে এক লক্ষ ঢাক, তিন লক্ষ শাঁখ বাজানো হয়। তবু তার রাজকীয় ঘুম ভাঙার কোনো লক্ষণ দেখা যায় না। শেষপর্যন্ত মদ্যমাংসের গন্ধে সে নিজেই উঠে বসে। এবং ঘুম ভেঙেই তার রাক্ষুসে আহারের বর্ণনা। সাতাশ কলসী মদ্যপানের পর—

‘হরিণ মহিষ বরা সাপটিয়া ধরে।
বারো তের শত পশু খায় একবারে।।’

তারপর যুদ্ধযাত্রার সময়ে সে আরও খেতে চায়। সে খাওয়া কেমন? না—

‘মদ খেয়ে উঘাড়িল সাত শত হাঁড়ি।।
নহে সে সামান্য হাঁড়ি কি কম বাখান।
পঁচিশের বন্দ যেন ঘর একখান।।’

তার যুদ্ধের ধরনও আলাদা— অস্ত্রের ধার সে ততো ধারে না।—

‘সহস্র সহস্র কপি সাপটিয়া ধরে।
পাতাল সমান মুখ তাহে লয়ে পোরো।’

শেষপর্যন্ত সুগ্রীব— ‘কর্ণ টানে দুহাতে কামড় ছিঁড়ে নাক’। তখন কুম্ভকর্ণের—

‘এত বল বিক্রম সকল হৈল মিছা।
সুগ্রীম বানরা বেটা করে গেল খোঁচা।।’

কুম্ভকর্ণের এই দুগতি কৃত্তিবাসের শ্রোতারা নিশ্চয়ই পরম আনন্দে উপভোগ করত, ঠিক যেমন মন্থরা, শূর্পণখা কিংবা রাবণের দুর্দশায় তারা খুশী হত।

হাস্যরস সৃষ্টির আর একটি সহজ উপায় ঔদারিকতার আতিশয্য। লঙ্কাকাণ্ডের শেষে অযোধ্যায় ফেরার পথে ভরদ্বাজের আশ্রমে বানরেরা চর্বচূষ্যলেহ্যপেয়ের বিপুল আয়োজন দেখে লোভ সামলাতে না পেরে ‘যতো পায় ততো খায় নাহি অবসাদ।’ এবং ‘নাড়িতে চড়িতে নারে পেট পাছে ফাটে।’ শেষপর্যন্ত ‘ঊর্ধ্ব দৃষ্টে রহে সবে নাহি চায় হেঁটে। কোনরূপ চিত হয়ে শুইলেক খাটে।।’ কৃত্তিবাসের কালে বাঙালী জনসাধারণের রসবোধ অনেকটা শিশুর মতো ছিল। তাই আকণ্ঠ ভোজনে কাতর বানরদের অবস্থা তারা শিশুর সারল্যে সানন্দে উপভোগ করত।

লঙ্কাকাণ্ডে আরও অনেক যুদ্ধ বর্ণনা আছে। কিন্তু তা বীর বা করুণরস না জাগিয়ে হাসির খোরাকই জোগায়। কৃত্তিবাসের হাতে বানরদের বীরত্ব ও যুদ্ধরীতি সর্বত্র একটা মজার প্রহসনে পরিণত হয়েছে। কুম্ভকর্ণের সঙ্গে যুদ্ধে তাদের পলায়ন-তৎপরতা দেখে যেমন হাসি পায়, ইন্দ্রজিতের নিকুম্ভলা যজ্ঞগারে তাদের যুদ্ধক্ষেত্র-বহির্ভূত ক্রিয়াকাণ্ড

দেখে তেমনি কৌতুক জাগে। রামায়ণের শ্রোতারা কোনো গভীর রসাবেগে আলোড়িত হওয়ার চেয়ে হাসি-কৌতুকের টুকরো টুকরো বর্ণনা শুনতেই বেশি আগ্রহ দেখাতেন। তাই রামায়ণ মূলতঃ করুণরসাত্মক হলেও তার আনুষঙ্গিক হিসেবে কৌতুকরস শ্রোতাদের মনোরঞ্জন করেছে— এবং বলা বাহুল্য কৃত্তিবাস হাস্যরস পরিবেশনে যোলো আনা সফল হয়েছিলেন।

৩.৫ রামায়াণ অনুবাদক হিসেবে কবি কৃত্তিবাসের অবদান

বৌদ্ধ পালরাজত্বের অন্তে সেন রাজবংশের কালে বাংলাদেশে পৌরাণিক হিন্দুধর্মের বিশেষ অভ্যুত্থান ঘটে। কিন্তু হিন্দুশাস্ত্র ও পুরাণ গ্রন্থ সবই সংস্কৃতে রচিত। তাই এই কালে অষ্টাদশ পুরাণের, বিশেষ করে রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবতের বাংলা অনুবাদ হওয়ার আত্যান্তিক প্রয়োজন দেখা যায়। আবার বাংলাভাষার সেই শৈশবে অভিনব কাব্যরচনা অপেক্ষা অনুবাদাশ্রয়ী রচনাই ছিল শ্রেয় পন্থা। গৌড় ও চট্টগ্রামের ভূপতি ভূস্বামীরা রামায়ণ মহাভারতের বিশেষ করে যুদ্ধবর্ণনামূলক অংশের বঙ্গানুবাদকে খুবই উৎসাহ দিতেন। এই সব কারণে প্রাক্ চৈতন্যকালে রামায়ণ মহাভারত ও ভাগবতের অনুবাদ কার্য আরম্ভ হয়। যাঁরা এই কার্যে ব্রতী হলেন, তাঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলেন, ধ্রুবানন্দ মিশ্রের মহাবংশীবলীর ভাষায়— ''কৃত্তিবাস কবিধীমান : সৌম্যশান্তোজনপ্রিয় : ।''

কৃত্তিবাসের জন্মকাল, তিনি যে গৌড়েশ্বরের রাজসভায় উপস্থিত হয়েছিলেন, তাঁর পরিচয়, এমনকি তাঁর আত্মবিবরণ সম্বন্ধে পণ্ডিতদের মতভেদের আজও নিরসন হয়নি। এই আত্মবিবরণ থেকে কৃত্তিবাসের যে পরিচয় পাওয়া যায়, তা হল এই 'পূর্বকালে বেদানুজ মহারাজার পুত্র বা পাত্র নরসিংহ ওঝা নিরাপদ আশ্রয় পাওয়ার জন্য পশ্চিমবঙ্গে, গঙগাতীরে 'ফুলিয়া' নামক এক গ্রামে এসে বাসস্থাপন করেন। তাঁর প্রপৌত্র বনমালীর পুত্র ছিলেন কৃত্তিবাস। কৃত্তিবাসের জন্মকাল সম্বন্ধে বলা আছে— 'আদিত্যবার শ্রীপঞ্চমী পূর্ণ (পুণ্য) মাঘ মাস।

তথি মধ্যে জন্ম লইলাম কৃত্তিবাস।।''

শ্লোকের জন্ম-তারিখ জ্ঞাপক পদটিকে 'পূর্ণ' ধরলে কৃত্তিবাসের জন্মকাল হয়, ১৪৩২ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই ফেব্রুয়ারী (৩০ শে মাঘ)। আবার এটিকে 'পুণ্য' ধরলে তারিখ হয় ১৩৯৮ খ্রীস্টাব্দের ১৬ই মাঘ।)। আবার এটিকে 'পুণ্য' ধরলে তারিখ হয় ১৩৯৮

মন্তব্য

খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই মাঘ। এই গণনা করেন শ্রী বসন্ত রঞ্জন রায় বিদ্ধদবল্লভ। তিনি অবশ্য আরো কয়েকটি সম্ভাব্য তারিখের কথা বলেছেন। অন্যান্য কয়েকজন পণ্ডিত আরও বিভিন্ন তারিখের উল্লেখ করেছেন।

কৃত্তিবাসের আত্মবিবরণীতে গৌড়েশ্বরের পাত্রমিত্র সভাসদ্‌গণের নাম ও বিবরণ আছে। কিন্তু গৌড়েশ্বরের নামের কোনো উল্লেখ নেই। তাই এই গৌড়েশ্বর কে ছিলেন তা নিয়েও পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে।

কৃত্তিবাস মূলতঃ বাল্মীকিকে অবলম্বন করলেও সর্বত্র তাঁর অনুসরণ করেননি। বাল্মীকির রামায়ণে বর্ণিত কার্তিকের জন্ম বা বশিষ্ট বিশ্বামিত্র বিরোধের উপাখ্যান কৃত্তিবাসের রামায়ণে পাওয়া যায় না। অদ্ভুত রামায়ণ, দেবী ভাগবত, মার্কন্ডেয়পুরাণ, আধ্যাত্ম রামায়ণ, যোগবশিষ্ট রামায়ণ, স্কন্দ-পুরাণ, বৃহদ্ধর্মপুরার, কূর্মপুরাণ, শিবপুরাণ, কালিকাপুরাণ, জৈমিনিভারত, সংস্কৃত উদ্ভট শ্লোক প্রভৃতি থেকে কাহিনী ও বর্ণনা কৃত্তিবাসের রামায়ণে সংযোজিত হয়েছে। আবার কৃত্তিবাসের রামায়ণে বর্ণিত গুহকের সঙ্গে রামের মিতালী, তরণীসেন বধ, অহিরাবন-মহীরাবণ কাহিনী এবং রামচন্দ্র কর্তৃক দেবী চন্ডিকার অকালবোধন ও একশত আটটি নীলপদ্মের কাহিনী ও কৃত্তিবাসের নিজস্ব সংযোজন বলে অনুমান করা হয়। বাল্মীকির রামচন্দ্র আদর্শ মানব, কৃত্তিবাসের রামচন্দ্র অবতার - ভক্তের ভগবান এবং অশ্রুসজল ও আগে ব্যাকুল। বাল্মীকির সীতা ক্ষত্রিয়া রমণী— কোমলতার সঙ্গে তেজস্বীতার অপূর্ব-সংমিশ্রণ। কৃত্তিবাসের সীতা ক্ষত্রিয়া রমণী— কোমলতার সঙ্গে তেজস্বীতার ।পূর্ব সংমিশ্রণ। কৃত্তিবাসের সীতা সর্বংসহা কাণ্ড কোমল বাঙালী বধূ মূর্তিমাত্র। কৃত্তিবাসের দশরথ অসহায় ক্লীব,লক্ষণ অপরিণামদর্শী উদ্ধত, রাবণ একদিকে যেমন বর্বর-দুর্বিনীত অন্যদিকে তেমনি প্রচ্ছন্ন ভক্তির গঙ্গোদকে নিত্যস্নায়ী।

কৃত্তিবাসের রামায়ণে আট রীতিনীতি পরিবেশ বাঙালী ও বাংলাদেশের রীতিনীতি ও পরিবেশের রূপ গ্রহণ করেছে। রামচন্দ্রজির জন্মের পর ছয়দিনে ষষ্ঠীপূজা, আটদিনে অষ্টকলাহ, ছয়মাসে অন্নপ্রাশনের বিবরণ আছে। এমনকি রামসীতার বিবাহের স্ত্রী-আচার বাঙালীর স্ত্রী আচারের প্রতিচ্ছবি। আহার্যের মধ্যে শাক, ভাজা, রোহিত-চিতল মাছের ঝোল, অম্বল, দধি, নারিকেল রসবড়া, মনোহরা, সরুচাকুলি, গুড়পিটা, তালবড়া, কলাবড়া, পায়স প্রভৃতির উল্লেখ পাওয়া যায়। রাবণ রাক্ষসদের 'বাটাভরা পান' দেবার

প্রলোভন দেখান।— এ ভোজন তালিকা অযোধ্যা মিথিলার নয়। একেবারে বাংলাদেশের রান্নাঘরে দৈনন্দিন প্রস্তুত খাদ্যবস্তুর রসমধুর বিবরণ। রবীন্দ্রনাথ তাই বলেছেন— ''এই বাংলা মহাকাব্যে কবি বাল্মীকির সময়ের সামাজিক আদর্শ রক্ষিত হয়নি। এর মধ্যে প্রাচীন বাঙালী সমাজ আপনাকে ব্যক্ত করেছে।''

মন্তব্য

কৃত্তিবাসের কবিত্বশক্তি ছিল—

''তুমি যদি ছাড় মোরে আমি না ছাড়বি,
বাজন নূপুর হয়ে চরণে বাজিব।।''

বা

''দশমুখ মেলিয়া রাবন রাজা হাসে।
কেতকী কুসুম যেন ফুটে ভাদ্রমাসে।।''

এইরূপ কবিত্বপূর্ণ শ্লোক রামায়ণের সর্বত্র ছড়িয়ে আছে।

কৃত্তিবাসের রামায়ণের ভাগবত-বৈশিষ্ঠ্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন— ''ভগবান যে শাস্ত্রজ্ঞানহীন অনাচারী বানরদের বন্ধু, কাঠবেড়ালীর অতি সামান্য সেবাও যে তাঁর কাছে অগ্রাহ্য হয় না, পাপিষ্ঠ-রাক্ষসকেও যে তিনি যথোচিত শাস্তি দিয়ে, পরাভূত করে উদ্ধার করেন, — এই ভাবটি কৃত্তিবাসে প্রবল হয়ে ভারতবর্ষের রামায়ণী কথার ধারাকে গঙ্গার শাখা ভাগীরথীর ন্যায় আর একটা বিশেষ পথে নিয়ে গেল।''

কৃত্তিবাসের কাব্য যাঁদের হাতে বারেবারে নব কলেবর ধারণ করেছে, তাঁদেরই একজনের কথাতে কবির পরম পুরস্কার।

''কৃত্তিবাস পণ্ডিতের সকরুণ বাণী,
হিয়া করে তোলপাড়, চক্ষে বহে পানি।।''

এইটিই বাঙালী পাঠকের রামায়ণ পাঠের মূল ফলশ্রুতি।

৩.৬ আত্মমূল্যায়নধর্মী প্রশ্ন

১। কৃত্তিবাস বাল্মীকি রামায়ণে কোন কোন অংশগুলি বর্জন করেছিলেন।

২। বাল্মীকি রামায়ণের কতটুকু অংশ কৃত্তিবাস সংযোজন করেছিলেন।

৩। বাংলা সাহিত্যে অনুবাদ প্রধানত কত রকমের ও কি কি?

মন্তব্য

৪। কবি কৃত্তিবাসকে কোন গ্রন্থে কেন পণ্ডিত বলে সম্মান জানানো হয়?

৫। কৃত্তিবাসী রায়ামণে কোন কোন রসের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়?

৬। কৃত্তিবাসী রামায়ণে ভক্তিবাদের কটি ধারা দেখা যায় ও কি কি?

৩.৭ গ্রন্থপঞ্জী

১। বাল্মীকি রামায়ণ (সারানুবাদ)— রাজশেখর বসু, এম. সি. সরকার এ্যান্ড সন্স ১৩৯০ (৯ম মুদ্রণ)

২। কৃত্তিবাসী রামায়ণ— হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, সাহিত্য সংসদ, ১৯৮৩।

৩। প্রাচীন সাহিত্য— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

৪। রামায়ণী কথা— দীনেশচন্দ্র সেন, জিজ্ঞাসা, ১৩৭৮ পৌষ।

৫। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (প্রথম খণ্ড)— অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মডার্ন বুক এজেন্সী ১৯৬৩।

৬। রামায়ণ ও ভারতসংস্কৃতি— প্রবোধচন্দ্র সেন, জিজ্ঞাসা ১৯৬২ এপ্রিল।

৭। 'বিবিধ প্রবন্ধ', উত্তরচরিত— বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

৮। প্রবন্ধ সংকলন : রামায়ণ— বুদ্ধদেব বসু, দে'জ পাবলিশিং ১৯৯১ জানুয়ারী।

৯। 'রবীন্দ্রনাথ : সৃষ্টির উজ্জ্বল স্রোতে', রামায়ণ ও রবীন্দ্রপন্থা— উজ্জ্বল কুমার মজুমদার, আনন্দ পাবলিশার্স ১৪০০ বৈশাখ।

১০। 'রবীন্দ্রসংস্কৃতির ভারতীয় রূপ ও উৎস, রামায়ণ— পম্পা মজুমদার, জিজ্ঞাসা ১৯৭২।

১১। জনজীবনে রামায়ণ— আশুতোষ ভট্টাচার্য, রবীন্দ্রভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাবিভাগীয় পত্রিকা : দ্বিতীয় বর্ষ ১৮৯১।

১২। বাল্মীকি ও কৃত্তিবাস— অজিত কুমার ঘোষ, ঐ

১৩। রবীন্দ্রভাবনায় রামায়ণ— পম্পা মজুমদার, বাংলা বিভাগীয় পত্রিকা (রবীন্দ্রভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়) ১৯শ সংখ্যা, ২০০২ ফেব্রুয়ারী।

১৪। 'কাহিনী', ভাষা ও ছন্দ— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

একক-৪ কৃত্তিবাসী রামায়ণ বাঙালিয়ানার প্রভাব, ভাষা ছন্দ ও অলঙ্কারের কৃতিত্ব ও ভক্তিবাদ।

বিন্যাসক্রম-

৪.১ কৃত্তিবাসী রামায়াণে বাঙালিয়ানার প্রতিফলন

৪.২ কৃত্তিবাসী রামায়াণে ভাষা, ছন্দ ও অলংকারের কৃতিত্ব

৪.৩ কৃত্তিবাসী রামায়ণে ভক্তিবাদের প্রভাব

৪.৪ আত্মমূল্যায়নধর্মী প্রশ্ন

৩.৫ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

৪.১ কৃত্তিবাসী রামায়ণে বাঙালিয়ানার প্রতিফলন

কৃত্তিবাসী রামায়ণ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ একসময় বলেছিলেন—

> ‘‘এই বাংলা মহাকাব্যে কবি বাল্মীকির সময়ের সামাজিক আদর্শ রক্ষিত হয় নাই। ইহার মধ্যে প্রাচীন বাঙালী সমাজই আপনাকে ব্যক্ত করিয়াছে।’’

বাংলা রামায়ণ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের এই মন্তব্য যে কতদূর সত্য এবার তার পরিচয় নেওয়া যাক।

কৃত্তিবাসী রামায়ণে বাঙালীর দৈনন্দিন জীবনের, তার মানসপ্রবণতা ও জীবনাদর্শের যে অনিবার্য ছায়াপাত ঘটেছে চরিত্রচিত্রণ ও রসবিচার প্রসঙ্গে আমরা তার উল্লেখ করেছি। সামাজিক আচার আচরণের বর্ণনাতেও আমরা দেখি ফুলিয়ার কবি কৃত্তিবাস নিজের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাকেই কাজে লাগিয়েছেন। তাই বাঙালীর রুচি পছন্দের মুখ চেয়ে বাঙালী কবি বিবাহ বর্ণনার সুযোগ পেলে ছাড়েন না, আর বিয়ের অনুষ্ঠানের যাবতীয় খুঁটিনাটি যথেষ্ট দক্ষতা ও উৎসাহের সঙ্গে ফুটিয়ে তোলেন। সেইজন্যে তিনি দশরথের বিয়ের বর্ণনা দেন, যা বাল্মীকি রামায়ণে নেই। এমন কি বাসি বিয়ে, কালরাত্রি, আড়িপাতা ইত্যাদি বিয়ের কোনো পর্বই তিনি বাদ দেননি। আবার রাম-লক্ষ্মণ-ভরত- শত্রুঘ্নের জন্ম হলে নবজাতকের জাতকর্ম ইত্যাদি বর্ণনায় বাঙালী হিন্দুর আচরণীয় সব সংস্কারকেই অনুসরণ করেছেন। যেমন শিশুর জন্মের পর পাঁচদিনে ‘পাঁচুটি’, ছ’দিনে ‘ষষ্ঠীপুজো’, আটদিনে ‘অষ্টকলাই’, তেরো দিনে ‘জননাশৌচান্ত’, ছ’মাসে ‘অন্নপ্রাশন’ ইত্যাদি। রাম-সীতার বিয়ে উপলক্ষ্যেও কৃত্তিবাস

মন্তব্য

অধিবাস, স্ত্রী-আচার, যৌতুকদান, বাসরঘরের রঙ্গরসিকতা, বধূবরণ ইত্যাদি অনুষ্ঠানগুলির নিখুঁত বিবরণ দিয়ে বাঙালীর সামাজিক আচার-আচরণকে যেন প্রত্যক্ষ করে তুলেছেন।

কৃত্তিবাসী রামায়ণের অনেক জায়গাতেই পশ্চিমবঙ্গের দৃশ্য ও দৈনন্দিন জীবনের ছবি ফুটেছে। গঙ্গা-অবতরণের বর্ণনায় কৃত্তিবাস গঙ্গাতীরের যে সব তীর্থের নাম করেছেন, যেমন মোড়াতলা, নদীয়া, নবদ্বীপ, সপ্তগ্রাম, আকনামাহেশ প্রভৃতি, সেগুলি সবই পশ্চিমবঙ্গের প্রসিদ্ধ গ্রাম। লঙ্কাকাণ্ডে দেখি রাবণ রাক্ষসদের 'বাটাভরি গুয়া' দেবার প্রলোভন দেখান আর হনুমান লঙ্কাদাহনের জন্য প্রথমেই 'বড় ঘরের চালে'র ওপর লাফ দিয়ে পড়েন। কোনো কোনো সমালোচক যে বলেছেন কৃত্তিবাসের হাতে স্বর্ণলঙ্কা যেন ফুলিয়া গ্রামে পরিণত হয়েছে একথার সত্যতা অস্বীকার করা যায় না। তাই রামের খোঁজে ভরত গুহকের কাছে এলে গুহক তাঁকে দই-দুধ, নারকেল-সুপারি, কলা-আম-কাঁঠাল দিয়ে আপ্যায়ন করেন। তার সঙ্গে রুই ও চিতল মাছও দিতে ভোলেন না। আর ঋষি ভরদ্বাজ তাঁর আশ্রমে ভরতের সৈন্যদের যা দিয়ে অতিথি সৎকার করেছেন তা হল।—

'চন্দ্রাবতী বড়া পীঠে মুগের সাম্‌লী।
সুধাময় দুগ্ধে ফেলে নারিকেল পলি।।...'ইত্যাদি।

আবার অযোধ্যায় ফেরার পথে রামের বানর বাহিনীকে ভরদ্বাজ 'ক্ষীর লাড়ু পাঁপড় মোদক রাশি রাশি' দিয়ে পরিতুষ্ট করেছেন। বলা বাহুল্য এ সবই বাঙালীর রসনালোভন ভোজ্য। কৃত্তিবাসের সীমিত কল্পনা এইসব খাদ্যতালিকায় মতিচুর, মোণ্ডা, রসকরা সরুচকলি, গুড়পিঠে, চিতুইপুলি, কলাবড়া, তালের বড়া, ছানাবড়া, খাজা, গজা, পায়েস ইত্যাদি বাঙালীর প্রিয় মিষ্টান্নগুলিকে স্থান দিয়েছে। শুধু পরিবেশনের পাত্রগুলিকে স্বর্ণময় করে তুলে ভরদ্বাজের তপোবনের দিব্য প্রভাবকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছে। উত্তরাকাণ্ডে সীতাদেবী চোদ্দ বছরের উপবাসী লক্ষ্মণকে স্বহস্তে রান্না করে যা খেতে দিয়েছিলেন তার বর্ণনাটি উল্লেখযোগ্য—

'প্রথমেতে শাক দিয়া ভোজন আরম্ভ।
তাহার পরে সূপ আদি দিলেন সানন্দে।।
ভাজা ঝোল আদি করি পঞ্চাশ ব্যঞ্জন।

ক্রমে ক্রমে সবাকার কৈল বিতরণ।। মন্তব্য

শেষে অম্বলান্ত হলে ব্যঞ্জনে সমাপ্ত।

দধি পরে পরমান্ন পিষ্টকাদি যত।।'

এই ভোজ্য অযোধ্যার বা মিথিলার নয়। এ নিতান্তই সাধারণ বাঙালীর পাকশালায় প্রস্তুত অন্নব্যঞ্জন। এর মধ্যে রাজকীয় আড়ম্বরের ছিটেফোঁটাও নেই। অযোধ্যার রাজবধূ সীতাও আচারে ব্যবহারে খাঁটি বাঙালী কুলবধূ। মুনিপত্নীরা সীতার কাছে রামের পরিচয় জানতে চাইলে—

'লাজে অধোমুখী সীতা, না বলেন আর।

ইঙ্গিতে বুঝান স্বামী ইনি যে আমার।।'

এখানে গুরুজনের সামনে সীতার লজ্জানম্র বধূমূর্তি সেকালের বাঙালী ঘরের কুলললনার চমৎকার প্রতিচ্ছবি। উত্তরাকাণ্ডে 'গৃধিনী ও পেচকের দ্বন্দ্ব' আখ্যানে যে পাখ্‌পাখালির বর্ণনা দেখি তারাও বাংলার ঘরের আনাচে কানাচে উড়ে বেড়ানো অতি পরিচিত পাখি। সে তালিকায় কাক-কোকিল-বক- সারস, চিলশকুন, পায়রা-বাবুই থেকে শুরু করে শুকসারী-কাকাতুয়া, মাছরাঙা-পেঁচা, কাঠঠোকরা, কাদাখোঁচা কেউই বাদ পড়েনি।

আঙ্গিকের দিক থেকেও দেখি বাল্মীকির সরল অনুষ্টুভ্ ছন্দ এখানে বাংলা-রামায়ণে পয়ার-লাচড়ীতে এসে দাঁড়িয়েছে। এছাড়া রায়বার অংশের শ্বাসাঘাত প্রধান ছন্দ কিছু বৈচিত্র সঞ্চার করেছে। এদিক থেকেতিনি ভারতচন্দ্রের পূর্বসূরী। অলংকার প্রয়োগেও কৃত্তিবাসের অভিনবত্ব চোখে পড়ার মতো। সংস্কৃত অলংকার প্রয়োগের বাঁধা পথেই তিনি আবদ্ধ হয়ে থাকেন নি। তাঁর উপমানের উপকরণ তিনি বাংলাদেশের দৈনন্দিন জীবন থেকে আহরণ করেছিলেন। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিলে বিষয়টি স্পষ্ট হবে। রাবণ সীতাকে হরণ করতে উদ্যত হলে 'জানকী কাঁপেন যেন কলার বাগুড়ি।' আর একটি উৎপ্রেক্ষা 'কুমারের চাক যেন ঘুরাইয়া ফেলে'। এছাড়া—

'দশ মুখ মেলিয়া রাবণ রাজা হাসে।

কেতকী কুসুম যেন ফুটে ভাদ্রমাসে।।'

কিংবা—

‘কুম্ভকর্ণ স্কন্ধে চড়ি বীরগণ নাচে।
বাদুড় দুলিছে যেন তেঁতুলের গাছে।।’

এইসব উপমান গ্রাম বাংলার চির-চেনা ছবি আর বাঙালীর দৈনন্দিন জীবন থেকে নেওয়া বলেই এই জাতীয় অলংকার কৃত্রিম গতানুগতিকতার পথ ছেড়ে কবির প্রকাশভঙ্গিতে একটা নতুন মাত্রা এনে দিয়ে বাঙালীর প্রাণের জিনিস হয়ে উঠেছে।

বাঙালীর পারিবারিক পরিহাসেরও একটি সুন্দর ছবি উত্তরকাণ্ডে পাওয়া যায়। রামের আজ্ঞায় সীতাকে নির্বাসনে নিয়ে যেতে এলে সীতা সরল মনে ভ্রাতৃজায়াসুলভ রসিকতা করেছেন।— ‘লক্ষ্মণে দেখিয়া পরিহাস করে সীতে’—

‘আইস দেবর আজি বড় শুভদিন।
এবে হে দেবর তুমি হয়েছ প্রবীণ।।
চৌদ্দ বৎসর একত্রে বঞ্চিলাম বনে।
রাজশ্রী পাইয়া তুমি পাসরিলে মনে।।
কহিয়াছি কত মন্দ কথা অবিনয়।
সে কারণে দেবর হে হয়েছে নির্দয়।।
বৈসহ বৈসহ লক্ষ্মণ সীতাদেবী বলে।
বার্তা কহ দেবর হে আছত কুশলে।।
তোমা না দেখিয়া মম সদা পোড়ে মন
উত্তর না দেহ কেন বিরস বদন।।’

এই পরিহাস বাঙালী পরিবারের বৌদি-দেবরের রঙ্গ কৌতুক। আগেই দেখেছি ‘অঙ্গদ রায়বারে’র (দ্রষ্টব্য ঃ রসবিচার, হাস্যরস) ‘আধা তর্জা’ জাতীয় স্থূল হাস্যপরিহাস ও ব্যঙ্গবিদ্রূপ বাঙালীর মধ্যযুগীয় জীবন ও সমাজ পরিবেশকে কিভাবে ফুটিয়ে তুলেছিল। আসলে রাষ্ট্রবিপ্লবের সংঘাত, তুর্কী-তাতার-পাঠান-মোগলের শাসনধীন হওয়ার কোনো যন্ত্রণা যে বাংলার নিস্তরঙ্গ জনজীবন কোনোরকম প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেনি বা তার জীবনকে নীতিভ্রষ্ট করে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারেনি তার কারণ কৃত্তিবাসী রামায়ণের মধ্যে থেকেই সে যুগের সাধারণ মানুষ তার জীবনের ছোটো বড়ো সবরকম আদর্শ খুঁজে পেয়েছিল। রাম-লক্ষ্মণের মধ্যেকারআদর্শ ভ্রাতৃত্বের বন্ধন, সতীত্ব ও সহিষ্ণুতার

প্রতিমূর্তি সীতার বধূজীবন, রাম-সুগ্রীব-বিভীষণের অকপট বন্দুত্ব, হনুমানের দাস্যভক্তি-এ সবই বাল্মীকির অযোধ্যা বা লঙ্কাপুরী ছেড়ে বাঙালীর ঘরের জিনিস হয়ে উঠেছিল। এই কাব্যে রাম-লক্ষ্মণ সীতা শুধু নন, দেব-দানব-রাক্ষসেরা সুদ্ধু মধ্যযুগীয় গৃহস্থ বাঙালী চরিত্রে পরিণত হয়েছেন।

বাল্মীকি আদি কবি এবং আদি কাব্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য তার বাস্তবতা। আসলে মহাকাব্য তো সভ্যতার সেই কিশোর বয়সের সৃষ্টি, যখন সাহিত্য একটি সচেতন শিল্পকর্মরূপে মানুষের মনে প্রতিভাত হয়নি। তাই তখনকার কবির বাস্তবতা এমনই নগ্ন ও নির্ভীক, এমন নির্মম ও এত সম্পূর্ণ যে আধুনিক পাশ্চাত্য রিয়ালিজমও তার কাছে লজ্জা পায়। তাই রামের বনবাসের খবর পেয়ে বাল্মীকির লক্ষ্মণ নিতান্ত গোঁয়ারের মতো বলে উঠতে পারেন যে ওই কৈকেয়ীভজা বুড়ো বাপকে তিনি বধ করবেন। বনবাসের উদ্যোগের সময় ভরতের প্রতি সন্দিহান হয়ে রাম ভরতের সামনে তাঁর প্রশংসা করতে নিষেধ করে সীতাকে বলেছেন যে ঋদ্ধিশালী পুরুষ (অর্থাৎ এখানে ভরত) অন্যের প্রশংসা সইতে পারে না। আর লঙ্কাকাণ্ডে যুদ্ধবিজয়ী রাম যখন সীতাকে প্রত্যাখ্যান করলেন, তখন সীতা তাঁকে এক 'প্রাকৃতজন' অর্থাৎ নীচ, ছোটলোক বলেছেন। কিন্তু বাঙালী কবি বাংলার জনগণের সামনে ভ্রাতৃত্বে, পুত্রত্ব ও সতীত্ব আদর্শের গৌরব রক্ষার খাতিরে এগুলি বর্জন করেছেন। সুতরাং কৃত্তিবাস শুধু যে সমসাময়িক দেশকালের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন তা নয়, সাধারণের সামনে চারিত্রিক আদর্শকে তুলে ধরে তার দ্বারা বাঙালীর জীবনকে নিয়ন্ত্রণও করেছেন। তাই নির্বিকার বাল্মীকি যখন ইন্দ্রিয়ভোগের জন্য অহল্যার ইন্দ্রকে স্বেচ্ছায় বরণের কথা বলেন তখন কৃত্তিবাস ইন্দ্রের ওপর প্রবঞ্চনার দোষ চাপিয়ে অহল্যার সতীত্বকে নিষ্কলঙ্ক করে দেখান। তেমনি সীতাহরণে রসময় রাবণ সীতার দেহসৌন্দর্যের বর্ণনায় কুণ্ঠাহীন, কিন্তু কৃত্তিবাসের নীতিবোধের কাছে সেটি বর্জনীয় বলে মনে হয়েছে। আবার সীতার সঙ্গে রাবণের দূরত্ব ও সীতার বিশুদ্ধি বজায় রাখার জন্যে কৃত্তিবাস লক্ষ্মণের গণ্ডি দেবার ব্যাপারটি কল্পনা করেছেন যেটি বাল্মীকিতে নেই। এইভাবেই বাঙালী কৃত্তিবাস বাঙালী জীবনাদর্শের উপযোগী করে আর্য রামায়ণের চরিত্রগুলিকে শোধন করে নিয়েছেন। সেইজন্যে বনবাসী রাম-লক্ষ্মণেরা বাল্মীকি রামায়ণে স্বাভাবিক কারণেই মাংসভোজী ও মদ্যপায়ী হলেও কৃত্তিবাসী রামায়ণে তারা ফলমূলাহারী হয়ে সাত্ত্বিক জীবনযাপন

মন্তব্য

করে। আবার বাল্মীকির রাম নরশ্রেষ্ঠ হলেও মানবিক দুর্বতার অতিশায়ী যেমন তা বোঝা যায় সীতাহরণের পর বর্ষা ও শরৎ বর্ণনা প্রসঙ্গে আদি কবি যখন স্পষ্ট ভাষায় রামচন্দ্রের কামবিকার বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এই প্রসঙ্গটি বিষ্ণুর অবতার ভগবান রামচন্দ্রের পক্ষে অসঙ্গত, সুতরাং বর্জনীয় বলে কৃত্তিবাসের মনে হয়েছে।

অরণ্যকাণ্ডে রামকে-খুঁজতে-আসা সৈন্যদলকে ঋষি ভরদ্বাজ তাঁর তপোবনে দেবভোগ্য উপকরণে আপ্যায়িত করেছিলেন। বাল্মীকি তার বর্ণনা দিয়ে বলেছেন—

> এক একজন পুরুষকে সাত আটজন সুন্দরী স্ত্রী নদীতীরে নিয়ে গিয়ে স্নান করিয়ে অঙ্গ সংবাহন করে মদ্যপান করাতে লাগল। পানভোজনে এবং অপ্সরাদের সহবাসে পরিতৃপ্ত সৈন্যগণ রক্তচন্দনে চর্চিত হয়ে বললে,— আমরা অযোধ্যায় যাব না, দণ্ডকারণ্যেও যাব না, ভরতের মঙ্গল হক, রাম সুখে থাকুক।

এদিকে কৃত্তিবাসের বর্ণনায় দেখি—

> ‘দেবকন্যা অন্ন দেয় সৈন্যদল খায়।
> কে পরিবেশন করে জানিতে না পায়।।
> ঘৃত দধি দুগ্ধ মধু মধুর পায়স।
> নানাবিধ মিষ্টান্ন খাইল নানারস।।
> চর্ব চোষ্য লেহ্য পেয় সুগন্ধি সুস্বাদ।
> যত পায় তত খায় নাহি অবসাদ।।
> মধুকর মধুরীঝঙ্কারে কাননে।
> অপ্সরারা নৃত্য করে গীত আলাপনে।।
> সবে বলে দেশে যাই হেন সাধ নাই
> অনায়াসে স্বর্গ মোরা পাইনু হেতাই।।’

এখানে দেখা যাচ্ছে অন্যসব প্রসঙ্গের মতো ইন্দ্রিয়সুখের প্রসঙ্গেও বাল্মীকির কল্পনা অকুণ্ঠ। কিন্তু নীতিবাগীশ কৃত্তিবাসের মনে সঙ্কোচ আছে বলেই ভরদ্বাজের আতিথ্যে তিনি শুধু দেখেছেন ঔদরিকতার আকণ্ঠ উদারতা’। কৃত্তিবাসের সৈন্য সামন্তরা শাক-ভাত খেয়ে মানুষ, হঠাৎ বড়ো দরের নেমন্তন্ন পেয়ে এত খেয়ে ফেলেছে যে আর নড়তে

পারছে না। বাল্মীকির ভোজ্যতালিকা রাজকীয়; কিন্তু মদ্যমাংস বাদ দিতে গিয়ে কৃত্তিবাস সুবৃহৎ ফলারের বেশী কিছু জোটাতে পারেননি। তাই বুদ্ধদেব বসু মন্তব্য করেছেন— মন্তব্য

> ''কৃত্তিবাস যে সভ্যতার প্রতিভূ তার অশন বসন রীতিনীতি সবই অনেকটা নিচু স্তরের; আর বাল্মীকি যদিও তপোবনবাসী বলে কথিত, তবু তিনি রাজধানীরই মুখপাত্র, শ্রেষ্ঠ অর্থে নাগরিক, তুলনায় কৃত্তিবাসকে মনে হয় রাজার দ্বারা বৃত হয়েও প্রাদেশিক, কেননা তাঁর রাজা নিজেই তাই।... বাল্মীকির পাশে কৃত্তিবাস বাঙালী মাত্র, শুধু বাঙালী।''
>
> — প্রবন্ধ সংকলন, রামায়ণ ১৯৪৭

তাই কৃত্তিবাস বাল্মীকির বাংলা অনুবাদক নন, তিনি রামায়ণের বাংলা রূপকার। এবং গ্রন্থটির প্রাকৃতিক এবং মানসিক আবহাওয়া একান্তই বাংলার।

৪.২ কৃত্তিবাসী রামায়াণে ভাষা, ছন্দ ও অলংকারের কৃতিত্ব

কবির কৃতিত্ব কবিত্ব ধর্মের পাশাপাশি কাব্যনির্মিতির উপরও নির্ভরশীল। সার্থক ভাষা, ছন্দ ও অলঙ্কারের প্রয়োগ কবির কাব্যদেহ ও কাব্যরীতির যথার্থ পরিচয়বাহী। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের কবিগণ এ ব্যাপারে মাত্রাতিরিক্ত সচেতনতার পরিচয় না দিলেও, কাব্যদেহ গঠনে তাঁরাও খুব উদাসীন ছিলেন না। কৃত্তিবাস পণ্ডিত কবি সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু কৃত্তিবাস পণ্ডিতের 'শ্রীরাম পাঁচালী'র ভাষা বিষয়ক আলোচনায়-যথেষ্ট সমস্যার উৎপত্তি ঘটে। বর্তমানে বাজারে চালু কৃত্তিবাসী রামায়ণে কতখানি কৃত্তিবাসের কবিত্ব রক্ষিত, সে সম্পর্কে যথেষ্ট সন্দেহ আছে! ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মনে করেন, ''কৃত্তিবাসী রামায়ণের প্রাচীন পুঁথিতে ভাষা ও ছন্দের কিছু ত্রুটি থাকলেও বর্ণনা সহজ, সরল ও সরস। কথক বা নকলনবিশেরা এর কিছু অংশ নিজ নিজ প্রয়োজনে বদলিয়ে নিয়েছেন, ফলে ভাষার বিশুদ্ধি ক্ষুণ্ণ হয়েছে'' (বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত ঃ প্রথম খণ্ড)। ভাষা সম্পূর্ণ শুদ্ধ না হওয়া সত্ত্বেও কৃত্তিবাসের প্রবচন, কথ্যবুলি বা লোকবুলির প্রয়োগ, নামধাতুর ব্যবহারে যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় মেলে। এছাড়া কৃত্তিবাসী রামায়ণের ভাষায় আরবী-ফারসীরও প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

মন্তব্য

কৃত্তিবাস যে সময় রামপাঁচালী রচনা করেছেন, সেই সময় পয়ার সদ্য জন্মলাভ করেছে। তাই পয়ার ছন্দের ১৪ মাত্রা সর্বদা রক্ষিত হয়নি এবং ছত্রের মধ্যে পয়ার ছন্দে ত্রুটি ধরা পড়েছে—

‘বনবাসে জদি চলিল রঘুনাথে।
সেই দিন হৈতে রাজা পড়্যা থাকে পথে।।
কৌশল্যা সুমিত্রা রাজারে কৈল কোলে।
চন্দ্রতারা বেষ্ঠিত দশরথের শরীরে।।’

(হীরেন্দ্রনাথ দত্ত সম্পাদিত কৃত্তিবাসী রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ড)

ত্রিপদী (লাচাড়ী) ছন্দে কৃত্তিবাস কিছু দক্ষতা প্রদর্শন করেছেন।

‘শুন মহাশয় জানিনু নিশ্চয়
তুমি ত্রিদিবের নাথ।
লঙ্কার ঈশ্বরী নাম মন্দোদরী
কহর জোড় করি হাথ।।’

কৃত্তিবাসের সময় ছড়ার ছন্দের সৃষ্টি হয়নি। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার তার একটা আভাষ কৃত্তিবাসের ছন্দে পাওয়া যায়। যেন—

আত্মছিদ্র না জানিস পরকে দিস খোঁটা।
বারে বারে কহিস কথা মর রে পাজি বেটা।।

সাহিত্যের ইতিহাসকার ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মনে করেন, ‘‘কৃত্তিবাস অলঙ্কার ব্যবহারেও কিছু নূতনত্ব সৃষ্টি করেছেন। একই সঙ্গে সংস্কৃত অলঙ্কার এবং বাংলার পরিচিত শব্দ বযবহার করে তিনি বৈচিত্র্য সৃষ্টি করতে চেয়েছেন’’ (বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত ঃ প্রথম খণ্ড)। এইরকম কিছু অলঙ্কার—

১. ‘দশমুখ মেলিয়া রাবণরাজা হাসে।
কেতকীকুসুম যেন ফুটে ভাদ্র মাসে।’

২. ‘অশোকে থাকেন সীতা অশোক কাননে।

হৃদয়ে সর্বদা রাম সলিল নয়নে।।' মন্তব্য

৩. 'পৃষ্ঠ ভরে কুঁজের নাড়িতে নারে চেটী।

কুঁজ নহে তাহার, সে বুদ্ধির চুপড়ী।।'

৪. 'ভরত আছাড় খেয়ে পড়েন সেক্ষণে।

কাটিলে কদলী যেন ভূমিতে লোটায়ে।।'

৫. 'খান্দা নাকে ধান্দা লাগে ভাসে রক্ত স্রোতে।'

৬. 'তুমি যদি ছাড় মোরে আমিনা ছাড়িব।

বাজন-নূপুর হয়ে চরণে বাজিব।।'

৭. 'রাজার রক্ষক যত সাক্ষাৎ তক্ষক।

রড়ে যথা ভক্ষ্য লক্ষ্যি সমক্ষে রক্ষক।।'

৮. 'কুম্ভকর্ণ স্কন্ধে চড়ি বীরগণ নাচে।

বাদুড় দুলিছে যেন তেঁতুলের গাছে।।'

''এই সমস্ত দৃষ্টান্ত এই কারণে উল্লেখযোগ্য যে, এতে যেমন আলঙ্কারিক নিপুণতা প্রকাশ পেয়েছে,তেমনি এর তির্যক বাগভঙ্গী বেশ উপাদেয় হয়েছে, তার সঙ্গে মিশ্রিত হয়েছে বাঙালির দৈনন্দিন জীবনচিত্র'' (ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, প্রথম খণ্ড)। যে অলঙ্কারের সঙ্গে কবির ব্যক্তিত্ব যুক্ত থাকে, সেটাই সার্থক অলঙ্কার। কবি কৃত্তিবাস প্রথাসিদ্ধ অলঙ্কার ব্যবহার করেননি। ভাষা, ছন্দে ও অলঙ্কার প্রয়োগেও কৃত্তিবাস বাংলাদেশকেই প্রতি মুহূর্তে মনে করিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ সেই কারণেই মন্তব্য করেছেন, ''এই বাংলা মহাকাব্যে বাল্মীকির সময়ের সামাজিক আদর্শ রক্ষিত হয় নাই। ইহার মধ্যে প্রাচীন বাঙালি সমাজই আপনাকে ব্যক্ত করিয়াছে।'' কৃত্তিবাসও কাব্যের মধ্যে ভারতাত্মাকে সন্ধান করেননি, বাঙলার মুখচ্ছবিকেই প্রতিফলিত করতে চেয়েছেন। ''তার বর্ণনায় চিত্রকুট পর্বত আমাদের ধানখেতের পাশে স্থাপিত হয়েছে, উল্লিখিত সমুদ্র বাংলাদেশের খাল-বিল-জলাশয়ে পরিণত হয়েছে এবং রাম রাবণের যুদ্ধ দুই গ্রাম্য জমিদারের কলহ-কাজিয়ায় পর্যবসিত হয়েছে'' (ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, প্রথম খণ্ড)।

কৃত্তিবাসের 'রামায়ণ পাঁচালী' বাংলা ভাষায় বাল্মীকি রামায়ণের সর্বশ্রেষ্ঠ অনুবাদ।

তা সত্ত্বেও অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষার মতো এই বাংলা ভাষাতেও আরো অনেক কবি রামায়ণ অনুবাদ করেছিলেন। অধ্যাপক মনীন্দ্রমোহন বসু রামায়ণ অনুবাদক সেই কবির সংখ্যা ৫১ জন বলেই মনে করেন। অদ্ভুতাচার্য যাঁর আসল নাম নিত্যানন্দ আচার্য এই পর্যায়ের কবিদের মধ্যে সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য অনুবাদের ক্ষেত্রে এই কবি শুধু বাল্মীকি রামায়ণ নয়, অন্যান্য রামায়ণও অনুসরণ করেছিলেন রামায়ণের অপর এক বিখ্যাত কবি মনসামঙ্গলের কবি বংশীদাসের কন্যা চন্দ্রাবতী। ''তাহা ছাড়া কৈলাস বসু, রামশংকর দত্ত, ভবনী দাস, দ্বিজ লক্ষ্মণ, রামানন্দ ঘোষ, রঘুনন্দন হরেন্দ্রনায়ারণ প্রভৃতি নাম উল্লেখযোগ্য। শেষের দিকের অর্থাৎ ঊনবিংশ শতকের রামায়ণের কবিদিগের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হইতেছেন রঘুন্দন গোস্বামী। তাঁহার রচিত রামরসায়ন সুলিখিত বিরাট গ্রন্থ'' (শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা, প্রথম খণ্ড-আদি ও মধ্য যুগ)।

৪.৩ কৃত্তিবাসী রামায়ণে ভক্তিবাদের প্রভাব

কৃত্তিবাসের 'শ্রীরাম পাঁচালীতে একদিকে যেমন বৈষ্ণব দাস্যভক্তির প্রভাব, অন্যদিকে তেমনি শাক্তভক্তিরও প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। এই ভক্তিবাদ প্রক্ষিপ্ত কিনা সে সিদ্ধান্ত তর্কের ব্যাপার। কৃত্তিবাসী রামায়ণের ভক্তিবাদ প্রসঙ্গে ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় স্পষ্ট সিদ্ধান্ত করেছেন, ''কৃত্তিবাসে ভক্তির দুটি স্বরূপ লক্ষণীয়। একদিকে নামাশ্রয়ী রামভক্তিবাদ, আর একদিকে পরাৎপরা আদ্যাশক্তির বাৎসল্যভাব'' (বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্তঃ প্রথম খণ্ড)। প্রাক্-চৈতন্য যুগেই রাম-কথাকে আশ্রয় করে যে ভক্তির প্লাবন বাঙালির চিত্তলোকে পৌঁছে দিয়েছিলেন কৃত্তিবাস, তা এককথায় দুর্লভ। এই ভক্তিবাদে আবেগ-উচ্ছ্বাসের তীব্রতা হয়তো ততটা নেই, কিন্তু 'রাম নাম উচ্চারণে সর্বপাপক্ষয়-বৈধী ভক্তির এই নিষ্ঠা ছিল পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত। কৃত্তিবাস এই আহ্বাস দিয়েছিলেন যে, যাবতীয় বিভেদ-বৈষম্য সত্ত্বেও রামনাম উচ্চারণেই ঘটবে মুক্তির একমাত্র উপায়। রামচন্দ্র সর্বপাপহর-ভক্তির এই একমুখী ভাবনাই কৃত্তিবাসের কাব্যের মূল সুর।

দশরথ ভুলবশত অন্ধমুনির পুত্রকে হত্যা করলে তিনি পাপের প্রায়শ্চিত্তের কারণে বশিষ্টপুত্র বামদেবের সমীপে উপনীত হন। বামেদেবের তখন একটাই কাজ—

‘বিচার করয়ে মুনি আগম পুরাণ।
বাল্মীকি যে মন্ত্র জপি পাইলেন ত্রাণ।।
তিনবার বলাইল সেই রামনাম।
পাইলেন ভূপতি সে পাপেতে বিরাম।।’

প্রকৃতপক্ষে সংস্কৃত রামায়ণের বীর রামচন্দ্র কৃত্তিবাসী রামায়ণে ভক্তের ভগবানে পরিণত হয়েছে। রামভক্তির বাড়াবাড়ি এমন পর্যায়ে গেছে যে, লঙ্কাযুদ্ধে রামনাম উচ্চারণে রাক্ষসেরা মুক্তি পেয়েছে, কিন্তু বানরদের মুক্তি হয়নি। কারণস্বরূপ ইন্দ্র বলেছেন—

‘রাবণেরে মার বলি কপিগণ মরে।
উদ্ধার পাইবে বল কি রামের জোরে।।
রামে মার শব্দ করে মরেছে রাক্ষস।
রাম নাম করে মরে গেছে স্বর্গবাস।।’

কৃত্তিবাসের রাম এই রকম পাপী তাপী উদ্ধারের আলোকদিশারী, ভক্তবৎসল। রবীন্দ্রনাথের মতে, এ ‘রামায়ণে ভক্তিরসই লীলা’। এই ভক্তি রামের প্রতি ভক্তি। কবি কৃত্তিবাসও স্পষ্ট কামনা করেছেন—

‘রাম নাম লৈতে ভাই না করিও হেলা
সংসার তরিতে রাম-নামে বান্ধ ভেলা।।
রামনাম স্মরি যেবা মহারাণ্যে যায়।
ধনুর্বাণ লয়ে রাম পশ্চাতে গোড়ায়।।’

ড. অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মনে করেন, ‘‘পরবর্তীকালে বৈষ্ণবপ্রভাব যে নামতত্ত্ব ভক্তিবাদের প্রধান অঙ্গরূপে পরিগণিত হয়েছিল, কৃত্তিবাসের রচনায় তার পূর্ব পরিচয় পাওয়া যাবে’’ (বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত ঃ প্রথম খণ্ড) কৃত্তিবাসের কাব্যে নাম ভক্তির পাশাপাশি দাস্যভক্তি সমান গুরুত্বে অঙ্কিত। একনিষ্ঠ ভক্তির ফলেই হনুমান বলতে পেরেছেন—

‘রাম হনুমৎ-প্রভু হনু রামদাস।
থাকুক সর্ব্বদা এই হনুর বিশ্বাস।।

তুমি প্রভু, আমি ভৃত্য চরণে তোমার।

এ সম্বন্ধে যেন দেব না মুছে আমার।।'

এই ভক্তি বাংলাদেশে শুধু দাস্যভক্তিতেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, মানবরসে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

রাম যে ভক্তবৎসল পতিতপাবন, দয়াময় তা যেমন তরণীসেন রাক্ষসের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে প্রমাণিত হয়, একই ভাবে প্রমাণিত হয়, যুদ্ধযাত্রার প্রাক্কালে স্ত্রী মন্দোদরীর বিলাপের উত্তরে রাবণের বক্তব্যের মধ্য দিয়ে—

'মরিব রামের হাতে ভাগ্যে যদি আছে।'

একইভাবে রামভক্তির এই প্রাবল্যেই মৃত্যুপথযাত্রী রাবণ প্রার্থনা জানান—

'অনাথের নাথ তুমি পতিত পাবন।

দয়া করে মস্তকেতে দেহ শ্রীচরণ।।

চিরদিন আমি দাস চরণে তোমার।

পাপেতে রাক্ষসকুলে জনম আমার।।'

এই ভক্তি একান্ত বাঙালির নিজস্ব। বাঙালির অন্তরের ভাব-প্রেরণা, ভক্তি, প্রেম সবগুলি বিষয় কৃত্তিবাসের কাব্যে স্থান পেয়েছে। ভক্তির রসে সিক্ত হয়ে গেছে কৃত্তিবাসের সমগ্র কাব্যদেহ। নামভক্তি, দাস্যভক্তির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে মাতৃভক্তি। ''কৃত্তিবাসী রামায়ণের রামচন্দ্র কখনো ব্রহ্মসনাতন, কোথাও বিষ্ণুর অংশাবতার, কোথাও ভক্তের ভগবান। কখনো বা রামচন্দ্র ও দেবী চণ্ডীর মধ্যে বাৎসল্য সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে।... শাক্ত ও বৈষ্ণবভাব চৈতন্যদেবের পূর্ব থেকেই বাংলাদেশে প্রচলিত ছিল। সুতরাং চৈতন্যপূর্বযুগে আবির্ভূত কৃত্তিবাসের রচনায় যুগপৎ বৈষ্ণব ও শাক্ত প্রভাব দেখলে বিস্ময়ের কারণ নেই'' (ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, প্রথম খণ্ড)। অর্থাৎ মাতৃভক্তিও কৃত্তিবাসী রামায়ণের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। তাই, শিবভক্ত রাবণের প্রতি শক্তিদেবী অসন্তুষ্টা নন। কৃত্তিবাসী রামায়ণে লঙ্কার অধিষ্ঠাত্রী দেবী সেই কারণেই উগ্রচণ্ডা কখনো আবার তাঁর অন্যরূপ। দেবীর এই রূপান্তরে বাঙালির মনঃ প্রকৃতির রৌদ্র-মেঘের লুকোচুরি খেলাই প্রতিফলিত। কখনো এই চণ্ডীদেবী 'কোপে অগ্নিমূর্তি হৈয়া রাক্ষসে সংহারে।' কখনো আবার এই দেবীর

'রাবণের বচনে চণ্ডীর হৈল হাস।
চৌষট্টি যোগিনী লৈয়া চলিলা কৈলাস।।'

এই যে মুহূর্তে ভীষণা, মুহূর্তে প্রসন্না, পাত্রপাত্রী নির্বিচারে বরদা— এই মাতা চণ্ডীই বাঙালির আরাধ্যা। এইসব মিলিয়েই কৃত্তিবাসের ভক্তিবাদ এবং তাঁর সাধনা, সিদ্ধি ও অনবদ্য কবিত্ব।

৪.৪ আত্মমূল্যায়নধর্মী প্রশ্ন

১। কৃত্তিবাসের কবিপ্রতিভার পরিচয় দিন।

২। কৃত্তিবাসী রামায়ণে কবির মৌলিকতা ও মূলানুগত্যের পরিচয় দিন।

৩। কৃত্তিবাসী রামায়ণে ভক্তিভাবের যে পরিচয় ব্যক্ত হয়েছে তা আলোচনা করুন।

৪। কৃত্তিবাসী রামায়ণের রস বিচার করুন।

৫। বাল্মীকির রামায়ণ-কাহিনী কৃত্তিবাসী রামায়ণের মূল উৎস হলেও একমাত্র উৎস ছিল না আলোচনা করুন।

৬। আর্য রামায়ণের অনুবাদ করতে গিয়ে কৃত্তিবাস কিভাবে তাঁর রামায়ণকে বাঙালির জীবনকাব্যে পরিণত করেছেন তার পরিচয় দিন।

৭। 'কৃত্তিবাসের লেখনীতে বাল্মীকি রামায়ণের চরিত্রগুলি বাঙালীয়ানায় মণ্ডিত হয়েছে'।— কয়েকটি প্রধান চরিত্র অবলম্বনে এ মন্তব্যের সমীচীনতা বিচার করুন।

৮। আখ্যানকাব্য হিসেবে কৃত্তিবাসী রামায়ণের সাহিত্যমূল্য নিরূপণ করুন।

৯। 'কৃত্তিবাসী রামায়ণে অনেক করুণ ঘটনার বিবরণ আছে, কিন্তু যথার্থ করুণরস সর্বত্র সৃষ্ট হয়নি'। — বিচার কর।

১০। 'বীররস নয়, হাস্যরস সৃষ্টিতেই কৃত্তিবাসের সার্থকতা'।— আলোচনা করুন।

১১। কৃত্তিবাসের লঙ্কাকাণ্ডে প্রত্যাশিত বীররসের পরিচয় দিন।

মন্তব্য

১২। বাল্মীকি রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের সঙ্গে কৃত্তিবাসী রামায়ণের লঙ্কাকাণ্ডের তুলনা করে কৃত্তিবাসের স্বাতন্ত্র্য নির্দেশ করুন।

১৩। কৃত্তিবাসী রামায়ণের 'আত্মবিরণী' ও 'অঙ্গদের রায়রার' অংশ প্রক্ষিপ্ত কি না বিচার করুন।

৪.৫ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

১। বাল্মীকি রামায়ণ (সারানুবাদ)— রাজশেখর বসু, এম. সি. সরকার এ্যান্ড সন্স ১৩৯০ (৯ম মুদ্রণ)

২। কৃত্তিবাসী রামায়ণ— হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, সাহিত্য সংসদ, ১৯৮৩।

৩। প্রাচীন সাহিত্য— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

৪। রামায়ণী কথা— দীনেশচন্দ্র সেন, জিজ্ঞাসা, ১৩৭৮ পৌষ।

৫। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (প্রথম খণ্ড)— অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মডার্ন বুক এজেন্সী ১৯৬৩।

৬। রামায়ণ ও ভারতসংস্কৃতি— প্রবোধচন্দ্র সেন, জিজ্ঞাসা ১৯৬২ এপ্রিল।

৭। 'বিবিধ প্রবন্ধ', উত্তরচরিত— বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

৮। প্রবন্ধ সংকলন : রামায়ণ— বুদ্ধদেব বসু, দে'জ পাবলিশিং ১৯৯১ জানুয়ারী।

৯। 'রবীন্দ্রনাথ : সৃষ্টির উজ্জ্বল স্রোতে', রামায়ণ ও রবীন্দ্রপন্থা— উজ্জ্বল কুমার মজুমদার, আনন্দ পাবলিশার্স ১৪০০ বৈশাখ।

১০। 'রবীন্দ্রসংস্কৃতির ভারতীয় রূপ ও উৎস, রামায়ণ— পম্পা মজুমদার, জিজ্ঞাসা ১৯৭২।

১১। জনজীবনে রামায়ণ— আশুতোষ ভট্টাচার্য, রবীন্দ্রভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাবিভাগীয় পত্রিকা : দ্বিতীয় বর্ষ ১৮৯১।

১২। বাল্মীকি ও কৃত্তিবাস— অজিত কুমার ঘোষ, ঐ

১৩। রবীন্দ্রভাবনায় রামায়ণ--- পম্পা মজুমদার, বাংলা বিভাগীয় পত্রিকা (রবীন্দ্রভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়) ১৯শ সংখ্যা, ২০০২ ফেব্রুয়ারী।

১৪। 'কাহিনী', ভাষা ও ছন্দ— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

একক -৫ ভাগবতের অনুবাদ, কাব্য কাহিনীর উৎস ও পরিচয়, রচনাকাল ও গৌড়েশ্বর প্রসঙ্গ।

বিন্যাসক্রম-

৫.১ ভাগবত অনুবাদ

৫.২ কাব্য কাহিনীর উৎস ও কাহিনী পরিচয়

৫.৩ কবি পরিচয়

৫.৪ কাব্য রচনাকাল ও গৌড়েশ্বর প্রসঙ্গ

৫.৫ আত্মমূল্যায়নধর্মী প্রশ্ন

৫.৬ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

৫.১ ভাগবত অনুবাদ

তুর্কী আক্রমণোত্তর বাংলায় আর্য ও আর্যতর সংস্কৃতির সমন্বয় আকাঙ্ক্ষার কারণে ঐশ্বর্যভাবের মূর্ত প্রতীক শ্রীকৃষ্ণের ভাগবতী লীলারস আস্বাদনের ফলস্বরূপ মালাধর বসুর ভাগবত অনুবাদ 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়'। কাব্যের কোন কোন পুঁথিতে যা 'গোবিন্দবিজয়' বা 'গোবিন্দমঙ্গল' নামেও পরিচিত। কাব্যটির অনুবাদ কর্মের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্বন্দে কবি নিজেই জানিয়েছেন—

''ভাগবত অর্থ যত পয়ারে বাঁধিয়া।
লোক নিস্তারিতে করি পাঁচালি রচিয়া।।"

অথবা

''ভাগবত কথা যত লোক বুঝাইতে।
লৌকিক করিয়া কহি লৌকিকের মতে।।"

ইত্যাদি।

'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' কাব্যটি তবু ভাগবতের অনুবাদ বা অনুসরণ হিসেবে বৈষ্ণব সমাজে সুপরিচিত। বৈষ্ণব সমাজের বাইরে কাব্যটির যে খুব জনপ্রিয়তা ছিল তা মনে হয় না। কারণ রামায়ণ মহাভারতের যেমন অসংখ্য পুঁথি পাওয়া গেছে, 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে'র পুঁথির সেরূপ প্রাচুর্য পরিলক্ষিত হয় না। তা সত্ত্বেও ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মনে করেন, ''একসময়ে এই গ্রন্থ সাধারণ বৈষ্ণব সমাজে উপনিষদ

মন্তব্য

বলে গৃহীত হয়েছিল। এরই মারফতে ভাগবতোক্ত কৃষ্ণকথা, শুধু বৈষ্ণবসমাজে নয়, সমগ্র বাঙালি সমাজে প্রচারিত হয়েছিল" (বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত ঃ প্রথম খণ্ড)।

৫.২ কাব্য কাহিনীর উৎস ও কাহিনী পরিচয়

সংস্কৃত রচিত অষ্টাদশ পুরাণ ও অষ্টাদশ উপপুরাণের মধ্যে ভাগবত অন্যতম। পুরাণ ধর্মগ্রন্থ, কিন্তু এগুলির মধ্যে ইতিহাস, সমাজ, দর্শন ও কাব্যরস মিশ্রিত হয়ে আছে। আর এই ছত্রিশখানি পুরাণের মধ্যে ভাগবত সর্বাধিক জনপ্রিয়। কারণস্বরূপ বলা যায়, প্রাচীনকালের এবং মধ্যযুগের বিভিন্ন বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের কাছে ভাগবত ধর্মগ্রন্থ বলেই সুপরিচিত। এই ভাগবত পুরাণের ১২টি স্কন্ধ (পরিচ্ছেদ), ৩৩২ অধ্যায় এবং ১৮, ০০০ শ্লোক। স্কন্ধগুলির মূল বিষয়ই হ'ল শ্রীকৃষ্ণ মাহাত্ম্য। বিশেষ করে ''ভাগবতের শেষ তিন স্কন্ধ (১০ম-১২শ) কৃষ্ণলীলায় সমৃদ্ধ বলে বৈষ্ণব সমাজ ও সাহিত্যে এর প্রচারই সর্বাধিক (বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত ঃ প্রথম খণ্ড)। এর মধ্যে আবার মালাধর বসু ভাগবতের দশম ও একাদশ স্কন্ধের কাহিনিসূত্র অবলম্বনে 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' কাব্যটির পরিকল্পনা করেছিলেন। ভাগবতের দশম স্কন্ধে কৃষ্ণের জন্ম থেকে দ্বারকালীলা বিস্তারিতভাবে বর্ণিত। মালাধর সমগ্র দশম স্কন্ধটাই গ্রহণ করেছিলেন। একাদশ স্কন্ধে কাহিনি যৎসামান্য হওয়ায় বেশ কিছু তত্ত্বাংশ বর্ণিত হয়েছে। যেমন— কৃষ্ণ-উদ্ধবের কথোপকথনের সাহায্যে মুক্তি, ধ্যানযোগ, শ্রীহরিবিভূতি, যতিধর্ম, জ্ঞান-কর্ম-ভক্তিযোগ প্রভৃতি এছাড়া মালাধর ভাগবত-বহির্ভূত বিষ্ণুপুরাণ ও হরিবংশের কাহিনি অনুসরণে বৃন্দাবনলীলা, নৌকালীলা ও দানলীলা কাব্যের বিষয়বস্তু হিসেবে গ্রহণ করেছেন। রাধাকৃষ্ণের লৌকিক প্রেমলীলাও কাব্যটির অন্তর্ভুক্তি। এ থেকে মনে হয় কবি সম্ভবতঃ পাঁচালী শ্রেণির কাব্য রচনার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন—

'ভাগবত শুনিল আমি পণ্ডিতের মুখে।
লৌকিক কহিয়ে সার বুঝ মহামুখে।।'

সাহিত্যের ইতিহাসকার ড. অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় অবশ্য মনে করেন, ''শ্রীকৃষ্ণবিজয় পাঁচালী জাতীয় রচনা হলেও মূল সংস্কৃতের সঙ্গেও এর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। তবে আক্ষরিক অনুবাদ কোনো কোনো সময়ে একেবারেই বর্জিত হয়েছে" (বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত ঃ প্রথম খণ্ড)।

মালাধর বসু 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে'-বৃন্দাবনলীলা, মথুরালীলা ও দ্বারকালীলা এই তিন লীলার কাহিনী বর্ণনা করেছেন। বৃন্দাবনলীলায় রাস, নৌকালীলা ও দানলীলা প্রভৃতির যে বর্ণনা মেলে তা ভাগবতবহির্ভূত, কারো কারো মতে তা প্রক্ষিপ্ত। শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের পুরাতন পুঁথিতে এই লীলাগুলির উল্লেখ নেই, রাধারও প্রায় সাক্ষাৎ মেলে না। তবে পরবর্তীকালের পুঁথিতে রাধার সখী ললিতা বিশাখা প্রমুখের উল্লেখ মেলে। 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' কাব্যটির বৃন্দাবনলীলায় অল্পস্বল্প আদিরসের পরিচয় থাকলেও, কাব্যটি প্রকৃতপক্ষে বীররসযুক্ত আখ্যানকাব্য। কেননা বর্ণিত তিন লীলাতেই কৃষ্ণের শৌর্যপূর্ণ বীরত্বের ছবিই প্রস্ফুটিত। ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সেই কারণে মনে করেন, নন্দনন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ' এই বাক্যটিকে চৈতন্যদেব যতই শ্রদ্ধা করুন না কেন, রাসবর্ণনা বাদ দিলে এ কাব্যে আদিরসের চেয়ে বীররসের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যাবে" (বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত ঃ প্রথম খণ্ড)। তাই বলা যায়, পরবর্তীকালে কৃষ্ণদাস কবিরাজ 'চৈতন্যচরিতামৃতে' বাক্যটির উল্লেখ করে বৈষ্ণব সমাজে 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' কাব্যটিকে জনপ্রিয় করে তুলেছিলেন। এই উল্লেখ না থাকলে, মাধুর্যভাবের সাধক গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের কাছে ভাগবতের বিরাট পুরুষ ঐশ্বর্যমণ্ডিত কৃষ্ণের লীলা গ্রহণযোগ্য হওয়ার ব্যাপারে রীতিমত সংশয় থেকে যেত।

মন্তব্য

ভাগবত পুরাণ গ্রন্থ হওয়ায়, এতে কৃষ্ণ প্রসঙ্গ ছাড়াও তত্ত্ব দর্শন ইতিহাস কিংবদন্তী প্রভৃতি বিষয়গুলি কাব্যের পক্ষে অনুপযুক্ত। তাই মালাধর শ্রীকৃষ্ণবিজয়কে কাব্যের রূপ দিতে গিয়ে কাহিনিকাব্যের অনুরূপ আদি-মধ্য-অন্তর্যুক্ত একটি নিটোল কাহিনি নির্মাণ করেছেন। কাহিনি সূত্রটি এইরূপ— ''কৃষ্ণলীলায় আদিকাহিনি কৃষ্ণের জন্ম থেকে মথুরা যাত্রা পর্যন্ত বিস্তৃত। মধ্যকাহিনি মথুরায় কংসবধ থেকে দ্বারকাযাত্রার পূর্ব পর্যন্ত বিন্যস্ত। অন্ত্যকাহিনিতে দ্বারকাপুরীতে কৃষ্ণের সবান্ধবে যাত্রা, দ্বারকা ধ্বংস ও কৃষ্ণের তনুত্যাগ পর্যন্ত বিস্তৃত।" (ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত ঃ প্রথমখণ্ড)। ভাগবত কাহিনির যথাযথ পরিচয় নিলে দেখা যাবে, নিষ্ঠাবান অনুবাদক হিসেবে ঐ যুগে মালাধর অগ্রগণ্য। কাহিনি অনুসরণ করলে দেখা যাবে, ভাগবতের দশম স্কন্ধের প্রায় পুরোটাই এবং একাদশ স্কন্ধের কৃষ্ণ-উদ্ধারের অধ্যাত্মযোগ বিষয়ক আলোচনা, যদু বংশ ধ্বংস এবং কৃষ্ণের তনুত্যাগের কাহিনির ব্যাপারে কবি ভাগবতের অনুসারী। তাছাড়া ভাগবতের দশম স্কন্ধের মোট আটটি অধ্যায়ে গোপী

মন্তব্য

প্রসঙ্গ এবং তার মধ্যবর্তী পাঁচটিতে বিস্তারিতভাবে রাসলীলা বর্ণিত। এ ব্যাপারে মালাধরের দৃষ্টিভঙ্গি বেশ স্বচ্ছ। কেননা এই গোপী প্রসঙ্গ এবং রাসলীলা 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' কাব্যে যথেষ্টই সংক্ষিপ্ত। মালাধর মূল ভাগবতের মনোযোগী পাঠক ছিলেন। এই দৃষ্টিভঙ্গির কারণে ভাগবতের কাহিনিকে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে অনুসরণ করেছেন। তা সত্ত্বেও কোন কোন বিষয়ে কবির স্বাধীন চিন্তার প্রকাশ ঘটেছে। যেমন— রাসমন্ডলে কৃষ্ণ-বর্জিত কোন এক গোপীকে মালাধর রাধার পরিচয়ে উপস্থাপিত করতেই পারতেন। কিন্তু কবি সে পথে যাননি। তাই সিদ্ধান্ত করা যায়, ''...মালাধর ভাগবতের আগাগোড়া আক্ষরিক অনুবাদ না করলেও মূল কাহিনির কোনও ব্যত্যয় ঘটাননি। পরবর্তীকালে বৈষ্ণব সমাজ ও সাহিত্যে শ্রীচৈতন্য প্রভাবে রাধাপ্রেম সর্বসাধ্যসার বলে গৃহীত হলে মালাধরের শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে তা লিপিকার ও গায়কদের দ্বারা প্রক্ষিপ্ত হয়েছিল বলে মনে হয়" (ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, প্রথম খণ্ড)। তবে 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে'র কহিনি প্রসঙ্গে একটি কথা বলতেই হয় যে, কৃষ্ণের মধুরলীলার প্রসঙ্গ গ্রহণ করে কবি সুবিবেচনার পরিচয় দিয়েছেন।

৫.৩ কবি পরিচয়

কবি মালাধরের জীবন সম্পর্কে কিছু বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায়। কেদারনাথ ভক্তিবিনোদ কবির জন্মস্থান কুলীন গ্রামে গিয়ে কিছু কুলপরিচয় সংগ্রহ করেন। তাছাড়া মালাধর বসু গ্রন্থের আরম্ভে ও পরিসমাপ্তিতে কিছু আত্মপরিচয় দিয়েছেন।

গ্রন্থ রচনার সন তারিখ সম্পর্কে কবি এরূপ উল্লেখ করেন—

তেরশ পঁচানব্বই শকে সন্থ আরম্ভন
চতুর্দশ দুইশকে হৈল সমাপান।

এই শ্লোকের প্রামাণিকতা স্বীকার করলে কবি ১৪৭৩ খ্রীষ্টাব্দে (১৩৮৫ + ৭৮) গ্রন্থ রচনা শুরু করেন এবং ১৪৮০ খ্রীষ্টাব্দে (১৪০২ + ৭৮) রচনাকার্য সমাপ্ত হয়। সুতরাং বলা যায়, শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্যের রচনাকাল পঞ্চদশ শতাব্দী।

গ্রন্থোৎপত্তি সম্পর্কে কবি লিখেছেন—

কায়স্থ কুলেতে জন্ম কুলীন গ্রামে বাস।
স্বপ্নে আদেশ দিলেন প্রভু ব্যাস।।

তার আজ্ঞামতে গ্রন্থ করিনু রচন। মন্তব্য

বদন ভরিয়ে হরি বল সর্বজন।

কবি আরো জানিয়েছেন যে, তাঁর কবিত্বশক্তিতে প্রীত হয়ে গৌড়েশ্বর তাঁকে গুণরাজখান উপাধিতে ভূষিত করেন—

গুণ নাই, অধম মূই নাই কোন জ্ঞান

গৌড়েশ্বর দিলা নাম গুণরাজ খান।

এই শ্লোকটির প্রামাণিকতা সম্পর্কে সন্দেহ আছে। কেদারনাথ ভক্তিবিনোদ মহাশয় এই শ্লোকটির কথা জানিয়েছেন। এটি প্রক্ষিপ্ত বলেই অনেকে মনে করেন। কারণ এ পর্যন্ত কোনো পুঁথিতেই এর উল্লেখ নেই। যাহোক, মালাধর কথিত এই গৌড়েশ্বর সম্পর্কেও মতভেদ আছে। কারো কারো মতে গৌড়েশ্বর হুসেন শাহ্। মতান্তরে গৌড়েশ্বর রুকনুন্দিন বরবকশাহ, সামসুদ্দিন ইউসুফ শাহ প্রভৃতি। বলা যেতে পারে, মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণ বিজয় ১৪৭৩ থেকে ১৪৮০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে রচিত। এই সময়ের মধ্যে গৌড়েশ্বর ছিলেন রুকুনুদ্দিন বরবক শাহ (১৪৫৯-১৪৭৪ খ্রীষ্টাব্দ)। আর তাঁর উপাধি লাভ যদি দেরীতে হয়ে থাকে তবে গৌড়েশ্বর হবেন তৎপুত্র সামসুদ্দিন ইউসুফ শাহ। সে যাহোক, কবি মালাধর গৌড়েশ্বরের সভাসদ ছিলেন তা অনুমান করা যায়।

বর্ধমান জেলার কুলীনগ্রামে বিখ্যাত কায়স্থ পরিবারে কবির জন্ম। পিতার নাম ভগীরথ, মাতার নাম ইন্দুমতী। মালাধরের পুত্র সত্যরাজ খান (অপর নাম রামানন্দ বসু) শ্রীচৈতন্য দেবের ভক্ত ও পার্ষদ ছিলেন। সবদিক বিচার করে মোটামুটিভাবে বলা চলে মালাধর বসু পঞ্চদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের লোক ছিলেন।

মহাপ্রভুর নামমন্ত্রের ষোলো নাম বত্রিশ অক্ষর হরি, কৃষ্ণ ও রাম এই তিনটি নামের বিচিত্র সমাবেশ। হরিনাম ভারতের ভক্তিজগতে সার্বজনীন, হরি পরিমেশ্বর ও সর্বজনের বন্দনীয় বলে তাঁর কোনো প্রতিকৃতি নেই। কৃষ্ণনাম ও রামনাম ভক্তি সাধনায় বিশেষ সম্প্রদায়ের পরাতত্ত্ববাচক শব্দ। মহাবদান্য মহাপ্রভুর শ্রেষ্ঠ দান দেবতা মানুষের ভালবাসার সম্পর্ক স্থাপন। গুণাতীত অবাঙ্মনসোগোচরকে সগুণ পুরুষোত্তমবাচক নামের সঙ্গে তিনি গেঁথে দিয়েছেন। অর্ধ সহস্রাব্দ ধরে এই নামমন্ত্র বাংলার আকাশে সর্বাধিক স্বরতরঙ্গ তুলেছে। রামকথা ও কৃষ্ণকথা এই দুই মহতী কথা আশ্রয় করে দীর্ঘকাল ধরে বঙ্গবাণী বীণায় ঝঙ্কার তুলেছেন। মহাপ্রভুর পূর্বে বাঙালির

মন্তব্য

সাহিত্য-সংস্কৃতির সুরকার একদিকে কৃত্তিবাস পণ্ডিত, আর একদিকে (বড়ু) চণ্ডীদাস ও মালাধর বসু। মৈথিল বিদ্যাপতিও এই সুরবিতানে সহযোগিতা করে গীতকে গোবিন্দায়িত এবং গোবিন্দকে গীতায়িত করে জয়দেব নামটির ঐতিহ্য স্ফুটতর করে তুলেছিলেন।

বড়ু চণ্ডীদাসের সমকালে, হয়ত বা কিছু পরে, মালাধর ভাগবতের কৃষ্ণকথা পয়ারে গাথেন। 'ভাগবতের অর্থ যত পয়ারে বান্ধিয়া। লোক নিস্তারিতে গাই পাঁচালি রচিয়া।' মালাধর মোটামুটি ভাগবতকে অনুসরণ করলেও তাঁর 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে' ভাগবত বহির্ভূত স্বতন্ত্র আখ্যায়িকা-ধারার সঙ্গে ভাগবত-কথা মিশিয়ে দিয়েছিলেন। বাংলায় ভাগবত প্রচারে তড়িৎ সঞ্চার করলেন মরমিয়া-রাজ মাধবেন্দ্র পুরী, মহাপ্রভুর পরম গুরু, ঈশ্বরপুরী ও কেশব ভারতীয় গুরু। আরাধ্যদেবতার জন্য চন্দনসংগ্রহ ব্যাপ্তদেশে তিনি বাংলায় এসে ভক্তির বীজ ছড়িয়ে গিয়েছিলেন। হয়ত কুলীনগ্রামের পথধূলিতে তাঁর চরণচিহ্নিত হয়েছিল। আদিশূরের আনীত যাজ্ঞিক পঞ্চবিপ্রের সঙ্গে এসেছিলেন উত্তর ভারতের পাঁচজন কায়স্থ, যাঁদের একজন দশরথ বসু। দশরথের অধঃস্তন ত্রয়োদশ পুরুষ মালাধর। মালাধর ছিলেনকুলীনগ্রামের অধিবাসী। শোনা যায়, কুলীন গ্রামের কৃষ্ণভক্তিপরায়ণ এই কুলীন অধিবাসীটি বল্লালী কৌলীন্যের আনুগত্য অস্বীকার করে পুত্রের বিবাহে স্বাধীনভাবে সামাজিক সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন। বোধ হয় মহাপ্রভুর আনীত স্বতন্ত্র কৌলীন্যের আগমনী সূচিত হয়েছিল মহাপ্রভুর প্রশংসিত এই কবি-ব্যক্তিটির আচরণে।

মালাধর শ্রীকৃষ্ণবিজয় রচনা করেন ১৪৭৩-১৪৮০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে। 'তেরশ' পঁচানব্বই শকে গ্রন্থ আরম্ভণ। চতুর্দশ দুই শকে গ্রন্থ সমাপণ'। 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের মতো বিরলপ্রচার গ্রন্থ না হ'লেও এর বেশি পুঁথি বাংলাদেশে পাওয়া যায়নি। এর প্রাচীনতম পুঁথি নাকি ১৪৮৩ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ রচনার প্রায় সমকালে অনুলিখিত হয় নটি উচ্ছরণ দত্তের দৌহিত্য বংশীয় হারাধন দত্ত ভক্তিনিধির কাছে ছিল যে পুঁথি অনুসরণ করে কেদারনাথ দত্ত ভক্তিবিনোদ ১৮৮৭ খ্রীঃ গ্রন্থের প্রথম মুদ্রিত সংস্করণ প্রকাশ করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথিশালায় রক্ষিত ১৬০৬ খ্রীস্টাব্দে অনুলিখিত পুঁথিদৃষ্টে অধ্যাপক খগেন্দ্র নাথ মিত্র ১৯৪৪ খ্রীঃ-এ 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়', 'শ্রীকৃষ্ণ-মঙ্গল' বা 'গোবিন্দ-মঙ্গল' সম্পাদন করেন। এর পরে ঢাকা থেকে নন্দলাল

বিদ্যাসাগর ১৯৪৫ সালে অষ্টাদশ শতকের অনুলিখিত পুঁথির ভিত্তিতে আর একটি সংস্করণ প্রকাশ করেন। গ্রন্থরচনার কালজ্ঞাপক দুটি পংক্তি হারাধন দত্ত ভক্তিনিধির পুঁথিতে পাওয়া যায়, অবশ্য এই পুঁথিটি পরে কারও দেখবার সুযোগ হয়নি। কিন্তু গ্রন্থরচনার এই কালটি মেনে নেওয়ার পক্ষে আমাদের বোধ হয় কোনও বাধা নেই।

দক্ষিণ-প্রত্যাগত মহাপ্রভু নীলাচলে বসু রামানন্দের প্রতি প্রীতিপ্রকাশ করেছিলেন ''তোমার কা কথা তোমার গ্রামের কুক্কুর। সেহো মোর প্রিয় অন্য জন রহু দূর!'' রথযাত্রা উপলক্ষ্যে গৌড়দেশ থেকে নীলাচলাগত ভক্তজনতার সঙ্গে প্রতিবৎসরে পট্টডোরী নিয়ে আসবার জন্য মহাপ্রভু বসু রামানন্দকে আদেশ দিয়েছিলেন। এক শতাব্দীর ব্যবধানে কৃষ্ণদাস কবিরাজ (বর্ধমান ঝামটপুরের অধিবাসী) নিজের উক্তিতে বলেছেন, 'কুলীনগ্রামের ভাগ্য/কহন না যায়। শূকর চরায় ডোম/সেহো কৃষ্ণ গায়।' মালাধর বসু-সম্পর্কে মহাপ্রভুর উচ্ছ্বসিত প্রশংসোক্তি, 'গুণরাজ খান কৈল/শ্রীকৃষ্ণবিজয়। তাহা এক বাক্য তাঁর/আছে প্রেমময়। নন্দনন্দন কৃষ্ণ/মোর প্রাণনাথ। এই বাক্যে বিকাইনু তাঁর তার বংশের হাত।' মহাপ্রফু মধুর ভজনের সংকেত পেয়েছিলেন মালাধরের বহু-সমাদৃত এই বাক্যটিতে।

মালাধর বসুকে গৌড়ের বাদ্‌শাহ গুণরাজ খাঁ উপাধিতে ভূষিত করেন। মালাধরের পৌত্র (মাতস্তর পুত্র) বসু রামানন্দ। চৈতন্যচরিতামৃত বহুবার 'সত্যরাজ রামানন্দ', একবার মাত্র 'সত্যরাজ আর রামানন্দ' নামোল্লেখ করেছেন। কেউ কেউ মনে করেন। সত্যরাজ উপাধিটি বসু রামানন্দই কোন বাদশাহের কাছ থেকে অর্জন করেন। আবার অন্যমতে মালাধরের পুত্র (লক্ষ্মীধর বসু) সত্যরাজ উপাধিধারী ছিলেন। রামানন্দ সত্যরাজ খানের পুত্র, গুণরাজ খানের পৌত্র। কুলীনগ্রামে মালাধরের গৃহের ধ্বংসাবশেষ আমরা দেখেছি। তার সন্নিকটে একটি শিবমন্দিরে বৃষমূর্তির পার্শ্বে উৎকীর্ণ আছে একটি সংস্কৃত শ্লোক, যার অর্থ এই, আমি খান্ শ্রীসত্যরাজ ১৪০৪ শতাব্দে ('শাকে বিশতি বেদে খে কনৌ হি') শিবসান্নিধ্যে এই বৃষস্থাপন করলাম। প্রতিষ্ঠার কাল ১৪৮২ অর্থাৎ 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' গ্রন্থ সমাপ্তির দু'বছর পরে এবং মহাপ্রভুর জন্মের চার বছর আগে। এ-সময়ে 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' কাব্যপ্রবণেতা গুররাজ খান জীবিত থাকতে পারেন, না-ও থাকতে পারেন। সত্যরাজ-উপাধিধারী ব্যক্তি গুররাজেরপুত্র বা পৌত্র যাই হোন না কেন, তাতে কালের দিক দিয়ে কোনো অসঙ্গতি নেই।

মন্তব্য

ষোড়শ শতাব্দীর দ্বিতীয়, দশকে মহাপ্রভুর সঙ্গে নীলাচলে মিলিত বসু রামানন্দ আর সত্যরাজ একই ব্যক্তি অথবা পিতাপুত্র দু'জন যাই হোন না কেন, তাতে কালবিচারে কোন অসুবিধা হয় না। কৃষ্ণদাস কবিরাজ বার বার সত্যরাজ রামানন্দ বলার একটি কারণ বোধ হয় এই। মহাপ্রভুর নীলাচল পরিকর অন্তরঙ্গতমদের একজন ছিলেন সাধ্য সাধনতত্ত্ব প্রবক্তা রায় রামানন্দ। রায় রামানন্দের প্রসঙ্গ ও নাম চৈতন্যচরিতামৃতকারকে বহুবার করতে হয়েছে। দুই রামানন্দকে পৃথক করবার জন্যই বোধ হয় 'সত্যরাজ রামানন্দ' এবং রায় রামানন্দ বলা হয়েছে। মহাপ্রভুর জন্মকাল পর্যন্ত বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, মালাধর ও কৃত্তিবাস এঁদের কেউ বোধ হয় জীবিত ছিলেন না। তাঁর পবিত্র জন্ম শতাব্দীটি স্পর্শ করে তাঁর আগমন-সম্ভাবনাকে তাঁরা ত্বরান্বিত করছিলেন, তাঁরা প্রেমধর্ম এবং নামমন্ত্র প্রচারের অনুকূল আবহের সৃষ্টি করেছিলেন।

মালাধর বসু ভাগবতের দশম ও একাদশ স্কন্ধের কৃষ্ণকথাশ্রিত অংশের অনুসরণ করে 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' রচনা করেছেন। ভাগবতের কৃষ্ণলীলা সমগ্রভাবে বাঙালিকে শোনাবার জন্য তিনিই প্রথম লেখনী ধারণ করেছেন। যুগোপযোগী ভাবে, দশমের রাসপঞ্চাধ্যায় (২৯শ থেকে ৩৩শ অধ্যায় পর্যন্ত) তিনি সংক্ষেপিত করেছেন। ভাগবত ভক্তিগ্রন্থ হ'লেও তাতে প্রকাশ বেশি। ভগবানের ঐশ্বর্যভাবের মধুর ভজনের মূর্তবিগ্রহ শ্রীচৈতন্য এর মাধুর্যের দিকটি নিজের জীবন দিয়ে তুলে ধরেছেন। তাঁর পূর্ববর্তী মালাধারের গ্রন্থে এতখানি আমরা প্রত্যাশা করতে পারি না।

৫.৪ কাব্য রচনাকাল ও গৌড়েশ্বর প্রসঙ্গ

'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' এর প্রাচীনতম মুদ্রিত গ্রন্থে কাব্য রচনাকাল জ্ঞাপক দুই ছত্র পয়ারের উল্লেখ মেলে—

''তেরশ পচানব্বই শকে গ্রন্থ আরম্ভন।
চতুর্দশ দুইশকে হইল সমাপন।।''

জনৈক কেদারনাথ দত্ত সম্পাদিত 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়'-এর মুদ্রিত সংস্করণ অদ্যাবধি প্রামাণ্য সংস্করণ রূপে স্বীকৃত। এই গ্রন্থেই কালজ্ঞাপক পয়ারের দেখা মেলে। কিন্তু এ ব্যাপারেও প্রাচীন সাহিত্যের রচনাকাল বিষয়ক পরিচিত বিতর্ক স্বাভাবিকভাবেই উত্থাপিত হয়। কেননা কেনো নির্ভরযোগ্য পুঁথিতেই এই শ্লোকের অস্তিত্ব নেই। তবে সাহিত্যের

ইতিহাসকার শ্রী ভূদেব চৌধুরীর অভিমত হ'ল, ''তবু সন্দেহ যাঁরা করেন, তাঁরাও এর মূল্য সম্পূর্ণ অস্বীকার করেননি; আর ড. সুকুমার সেন তো সিদ্ধান্তই করেছেন,— 'এই তারিখ প্রতিপক্ষ মনে করিবার কারণ নাই'' বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা ঃ ১ম পর্যায়)। অর্থাৎ বিতর্ক সত্ত্বেও এই শ্লোকটিকে যদি প্রামাণ্য বলে স্বীকার করে নেওয়া হয়, তবে মালাধর বসুর 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' কাব্যটির রচনারম্ভ ১৪৭৩ খ্রীষ্টাব্দ এবং সমাপ্তি ১৪৮০ খ্রীষ্টাব্দ। এইসূত্রে একটি কথা বলা যায় যে, পয়ারটির সত্যতা যদি প্রমাণসিদ্ধ হয়, তাহলে 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' কাব্যটিই সন তারিখযুক্ত প্রাচীনতম গ্রন্থ।

মন্তব্য

কবি মালাধর বসুর কাব্য রচনাকালে গৌড়েশ্বরের পরিচয় পেলে, কবির আবির্ভাব ও কাব্য রচনাকাল সম্পর্কে মোটামুটি একটি হিসেব মিলতে পারে। ''কিন্তু কোনো হিসেবেই হুসেন শাহকে এই গৌড়েশ্বর বলা যায় না। কারণ সুলতান ১৪৯৩-১৫১৯ খ্রী. পর্যন্ত গৌড়বঙ্গ শাসন করেছিলেন'' (ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, প্রথম খণ্ড)। অন্যদিকে খ্রী. রুকনুদ্দিন বরবকশাহের রাজত্বকাল। আর কবি মালাধর বসুও অনুবাদ কাব্যটির রচনারম্ভ ঘটান ১৪৭৩ খ্রীষ্টাব্দে। কবিকে 'গুণরাজখান' উপাধি দান তাই রুকনুদ্দিন বরবক শাহের পক্ষেই সম্ভব। শ্রীভূদেব চৌধুরীও মনে করেন, ''কবির নির্দিষ্ট এই কাল পরিচয় স্বীকার করে নিলে দেখা যায়, গ্রন্থখানির রচনাকাল দুইজন পাঠান সুলতান রুক্‌নুদ্দিন বারবক শাহ (১৪৫৯-১৪৭৪ খ্রিঃ) এবং সামসুদ্দিন ইউসুফ শাহ (১৪৭৪-১৪৮১ খ্রিঃ)-এর রাজত্বকালে বিস্তৃত হয়েছিল।'' (বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা ঃ ১ম পর্যায়)।

'গুণরাজ খান' উপাধি সম্পর্কে কাব্যমধ্যে কবি উল্লেখ করেছেন—

''গুণ নাই, অধম মুই, নাহি কোন জ্ঞান।
গোড়েশ্বর দিলা নাম গুণরাজ খান।।''

এই জাতীয় বক্তব্য থেকে অনেকের অভিমত হ'ল কাব্য রচনার শেষে কবি 'গুণরাজ খান' উপাধি লাভ করেন। তাহলে ঐ সময়ে যে পাঠান সুলতানকে পাওয়া যাচ্ছে তিনি সামসুদ্দিন ইউসুফ শাহ (১৪৭৪-৮১ খ্রীস্টাব্দ)। কেননা বরবক শাহের পুত্র বিদ্যোৎসাহী সুলতান হিসেবেই সাহিত্যে পরিচিত। কিন্তু ''ড. সুকুমার সেন এবং অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ মিত্র প্রভৃতি পণ্ডিতেরা মনে করেন— যেহেতু গ্রন্থের প্রথমাবধি

মন্তব্য

ভণিতায় উপাধিটি নিয়মিতভাবে ব্যবহৃত হয়ে এসেছে, সেই হেতু মনে করা উচিত যে, গ্রন্থ রচনার পূর্বেই কবির উপাধিলাভ ঘটেছিল। অতএব, মালাধরের উপাধিদাতা নবাব ছিলেন রুক্নুদ্দিন বারবক শাহ" (শ্রীভূদেব চৌধুরী, বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা, ১ম পর্যায়।)

৫.৫ আত্মমূল্যায়নধর্মী প্রশ্ন

১। শ্রীকৃষ্ণ বিজয় কাব্যকে অন্য আর কোন কোন নামে অভিহিত করা হয়?

২। মালাধর বসু তাঁর শ্রীকৃষ্ণ বিজয় কাব্যটি ভাগবতের কোন কোন স্কন্ধের কাহিনি অবলম্বনে রচনা করেছিলেন?

৩। মালাধর বসু তাঁর শ্রীকৃষ্ণ বিজয় কাব্যে কোন কোন লীলা বর্ণনা করেছেন?

৪। মালাধর বসু তাঁর শ্রীকৃষ্ণ বিজয় কাব্যটি কোন রাজার রাজত্বালে রচনা করেন?

৫.৬ সহায়ক পঞ্জী

১। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত - অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

২। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস - দেবেশ আচার্য।

৩। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস - ড. ক্ষেত্র গুপ্ত।

৪। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস - শ্রীমন্ত কুমার জানা।

একক - ৬ মালাধর বসুর কবিত্ব, বাঙালিয়ানা, কবিপ্রতিভা ও কাব্যের মূল্যায়ন।

বিন্যাসক্রম-

৬.১ মালাধর বসুর কবিত্ব ও কাব্যপরিচয়

৬.২ মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণ বিজয় কাব্যে বাঙালিয়ানা

৬.৩ কবিপ্রতিভা ও কাব্যের মূল্যায়ন

৬.৪ শ্রীকৃষ্ণ বিজয় মালাধর বসুর স্বাধীন রচনা

৬.৫ আত্মমূল্যায়নধর্মী প্রশ্ন

৬.৬ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

৬.১ মালাধর বসুর কবিত্ব ও কাব্যপরিচয়

মালাধর বসুর 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' বৈষ্ণব সমাজের অতিপরিচিতি গ্রন্থ হলেও, বৃহত্তর হিন্দু সমাজে এর পরিচিতি ব্যাপক হয়ে ওঠেনি। কারণস্বরূপ বলা যায়, রামায়ণ মহাভারতের অসংখ্য পুঁথির মতো এই কাব্যের অসংখ্য পুঁথি না পাওয়া। এই বিষয়ে ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়র মতামত হ'ল, ''বটতলা থেকে শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের একাধিক মুদ্রণ প্রকাশিত হয়নি। কেদারনাথ দত্ত ভক্তি বিনোদের সংস্করণ (১৭৮৬-৮৭ খ্রীঃ াঃ) ছাড়া শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের আর কোনো সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল বলে মনে হয় না। এ পর্যন্ত দু'খানি পুরাতন সংস্করণের সন্ধান পাওয়া গেছে'' (বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত প্রথম খণ্ড)। তবু ভাগবত জনপ্রিয় হয়েছিল এবং এই জনপ্রিয়তার বেশ কয়েকটি কারণ ছিল। প্রথমতঃ সমগ্র ভাগবতের শ্রদ্ধেয় গ্রন্থ ভাগবতের অনুবাদ 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়'। দ্বিতীয়ত ঃ মধ্যযুগের আদিপর্বে একজন ভক্তের রচিত গ্রন্থ এটি। তৃতীয়তঃ 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' কাব্যের এই উক্তি 'নন্দনন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ" যা শ্রীচৈতন্যকে অত্যন্ত মুগ্ধ করেছিল এবং বিশেষ 'প্রাণনাথ' শব্দে পরবর্তী বৈষ্ণব সমাজ নতুনভাবে আলোকপ্রাপ্ত হয়েছিল।

'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' কাব্যটির 'বিজয়' শব্দটির তাৎপর্য নিয়ে নানাজনের নানা মত। কারো মতে বিজয়ের অর্থ মৃত্যু বা মহাপ্রয়াণ। কেননা কাব্যটির পরিণতি শ্রীকৃষ্ণের কলেবর পরিত্যাগের বর্ণনার মধ্য দিয়ে। কারো কারো মতে 'বিজয়' শব্দের প্রকৃত

মন্তব্য

অর্থ হ'ল— দেবতার কীর্তি, বিজয়গৌরব, শোভাযাত্রা। তাই কাব্যটির 'বিজয়' শব্দটি' শ্রীকৃষ্ণের কীর্তিকাহিনি কিংবা গৌরবগাথা অর্থেই ব্যবহৃত হয়ে থাকবে। কাব্যটিকে কবি মালাধর কোথাও কোথাও 'গোবিন্দমঙ্গল' বলেও উল্লেখ করেছেন। এখানে মঙ্গল শব্দটি স্পষ্টতঃ মঙ্গল বিধায়ক দেবতার স্তুতি অর্থেই প্রযুক্ত। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ বা গৌবিন্দের কীর্তিগাথাই 'গোবিন্দমঙ্গল'।

মালাধর বসুর 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' বৈষ্ণবজনোচিত প্রেমভক্তির কারণে শ্রীচৈতন্যদেবের কাছ থেকে যে পরিমাণ প্রশংসা ও শ্রদ্ধা অর্জন করেছিল, কবিত্ব শক্তির কাছ থেকে ঠিক ততটা নয়। ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিমত হল, ''বিশাল ভাগবত পুরাণের কাহিনিকে সংক্ষিপ্তাকারে পরিবেশনের দিকে তাঁর অধিকতর দৃষ্টি ছিল, সচেতনভাবে কবিত্ব শক্তির পরিচয় দেবার জন্য তিনি কলম ধরেননি।" আর তাছাড়া কাহিনির অন্তর্গত সংগতির চেয়ে শ্রীকৃষ্ণের পৌরুষ শক্তির প্রবলতা প্রদর্শনের প্রতিই কবির লক্ষ্য ছিল সর্বাধিক। তাই মূল ভাগবতের কবিত্ব সমৃদ্ধ অংশগুলি মালাধর অধিকাংশ ক্ষেত্রে বর্জন করেছেন। অন্যবাবে বললে বলতে হয়, পঞ্চদশ শতাব্দীর বাংলা ভাষায় ভাগবতের গাম্ভীর্যপূর্ণ পংক্তিগুলির ধ্বনিঝঙ্কার ও প্রতিফলন আশা করা যায় না। তবে স্নিগ্ধ, কোমল ও পারিবারিক বর্ণনায় কবি কিছু দক্ষতার পরিচয় রেখেছেন। যেমন— ১০ম স্কন্ধের ২৯শ অধ্যায়ের রাসলীলার শুরুতে উপস্থিত গোপীগণকে স্বামীদের কাছে ফিরে যেতে বলায় তাদের বক্তব্য ভাগবতে এইরকম— ''পতিপুত্রাদি দুঃখদায়ক, তাহাদিগকে লইয়া কী হইবে? অতএব হে পরমেশ্বর! আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হও। হে কমললোচন! অনেকদিন হইতে যে আশা পোষণ করিয়া আসিতেছি তাহা ছেদন করিও না" (পঞ্চানন তর্করত্ন অনুদিত)। এই অংশে মালাধরের বর্ণনায় কবিত্বশক্তিকে অস্বীকারের উপায় নেই—

ছাড়িয়াত স্বামি পুত্র তেজি বন্ধুজন।
তোমাকে দেখিতে প্রার জাউক এখন।।
ছাড়ে ছাড়ুক স্বামি তারে নাহি বেথা।
তোমারে বিপ্রিয় বোল শুনি মনকথা।।'
'কি লাগি নিষ্ঠুর এত বল চক্রপাণি।

তোমাকে ভজিয়া মনে তেজিব পরাণি।।'

এই বর্ণনায় সাধারণ পাঠক দারুণ কিছু কবিত্ব শক্তির প্রমাণ পাবে না হয়তো। কিন্তু সে তুলনায় বৃন্দাবনলীলা বর্ণনা বেশ সরস। আর বিচ্ছিন্নভাবে কাব্যের বেশ কিছু অংশ উপভোগ্য ও সরস। যেমন— বহুকাল পরে কৃষ্ণের সঙ্গে যশোদার মিলনে মায়ের অভিমান প্রকাশ এককথায় অনবদ্য—

'কেমতে পাসরিলে তুমি গোকুল নগরী।
'কেমতে পাসরিলে সেই গোবর্দ্ধন গিরি।।
কেমতে পাসরিলে তুমি নদি সে জমুনা।
কেমতে পাসরিলে বাপু আসা দুই জনা।।'

কবিত্বপূর্ণ এইরকম বেশকিছু অসাধারণ বর্ণনা 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' কাব্যটির মাত্রা বৃদ্ধিতে সাহায্য করেছে। যেমন— শ্রীকৃষ্ণের মথুরা যাত্রার পূর্বে গোপীগণের বিলাপ—

'আর না জাইব সখি চিন্তামণি ঘরে।
আলিঙ্গন না করিব দেব গদাধরে।।
আর না দেখিব সখী সে চাঁদ-বদন।
আর না করিব সখী সে মুখ-চুম্বন।।'

* * * *

'অল্প ধনলোভে লোকে এড়াইতে পারে।
কানু হেন ধন সখী ছাড়ি দিব কারে।।'

কাব্যরসসমৃদ্ধ এইরকম কিছু পংক্তি বাদ দিলে মালাধর বসুর 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' যথার্থ অনুবাদমুখী সাহিত্য।

অনুবাদ প্রসঙ্গে কৃত্তিবাসের কাব্যধর্মের সঙ্গে কিন্তু মালাধরের মিল আছে। কৃত্তিবাসের মত মালাধরও লোকসাধারণের উপযোগী করে সংস্কৃত ভাগবতকে পয়ার ছন্দে অনুদিত করেছেন। কবি মূল ভাগবতের তত্ত্বসমৃদ্ধ অংশকে যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত করে বর্ণনা ও আখ্যান অংশকে সম্প্রসারিত করেন। তাই প্রধান বিষয়ের বাইরেও প্রয়োজনবোধে অন্য বিষয়ের যেমন সংযুক্তকরণ ঘটিয়েছেন, একইভাবে দরকার মতো মূল অংশেরও কিছু কিছু পরিবর্তন করেছেন কবি। প্রধান বিষয়ের অতিরিক্ত কিছু

মন্তব্য

কাহিনি মালাধরের নিজস্ব স্বাধীন রচনা, কিছু হরিবংশ ও বিষ্ণুপুরাণ জাতীয় সংস্কৃত পৌরাণিক গ্রন্থ থেকে গৃহীত। তাই বলা যায়, 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' সংস্কৃত ভাগবতের দশম ও একাদশ খণ্ডের আক্ষরিক বঙ্গানুবাদ নয়, মূল রচনার স্বাধীন ভাষান্তর, ভাবানুবাদ। কবি কৃত্তিবাসের মতো মালাধর বসুও বাঙালির রসরুচির দিকে দৃষ্টি রেখে বাঙালির কাব্য করে তুলেছেন।

কাব্যরীতির ক্ষেত্রে প্রথমেই আসে ভাষার কথা। পরবর্তী ক্ষেত্রে ছন্দের বাঁধুনিতে তার একটি মূর্তি গড়ে ওঠে। কাব্যটির এই ভাষা ও ছন্দের প্রসঙ্গে কেদারনাথ দত্ত ভক্তিবিনোদ অভিমত প্রকাশ করেছেন, ''এই গ্রন্থের ভাষা অলঙ্কৃত নয়। ইহার পদ্য অনেক স্থানেই সুমিষ্ট হয় নাই। চৌদ্দ অক্ষরের পয়ারের অনেক স্থলে ষোল-সতের অক্ষরে বা বার-তের অক্ষর দেখিতে পাওয়া যায়।'' এই বক্তব্য যথার্থ। ছন্দের ব্যাপারে বলতে হয়, মালাধরের সময়ে পয়ারের মাত্রাজনিত নানা ত্রুটি ছিল। কবিকে এ ব্যাপারে খুব একটা দোষ দেওয়া যায় না। অন্যদিকে প্রথাসিদ্ধ অলঙ্কারের পাশাপাশি বেশ কিছু অলঙ্কার প্রয়োগে কবি প্রতিভার স্পর্শ পাওয়া যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ কয়েকটি অলঙ্কারের উল্লেখ করা যায়—

১।পুন্নিমার চাঁদ জিনি বদন মণ্ডল।
খঞ্জন জিনিঞা শোভে নয়ন যুগল।।

*　　*　　*

পিতবস্ত্র পরিধান দেব বনমালি।
নূতন মেঝেতে পড়িছে বিজুলি।।

২. চৌদিকে গোপিনিগ মদ্ধে নন্দবালা।
পূন্নিমার চাঁদ জেন উদয় সোলকলা।।

৩. লাঙ্গলের ইস জেন দন্ত সারি সারি।
গিরিসম স্কন্ধ নাসিকা দেখিতে ভয়ঙ্করি।।

৪.গারড়ের হেন জুদ্ধ সাথে সাথে করি।
বুকে বুকে রাক্ষসি ছন্দ অবতরি।।
কুটিল কুন্তল শোভে মস্তক উপরে।

আকাশ মন্ডলে জেন রাহু সরোবরে।। মন্তব্য

৫. অচেতন হৈয়া দেবি পৃথ্বিতে পড়ে।

কদলির গাছজেল পড়ে অল্প ঝড়ে।।

উপমা-উৎপ্রেক্ষা সমৃদ্ধ অলঙ্কারে কবির দক্ষতা সেই অর্থে বিশেষ কিছু নেই। তবে কবি একেবারেই নকলনবিশ এবং অক্ষম অনুকারী তা অবশ্য বলা যাবে না। আসলে কৃষ্ণের ঐশ্বর্যরূপ বর্ণনায় মালাধরই বাংলা সাহিত্যের পথপ্রদর্শক কবি। এই বিষয়টিকে কাব্যের উপাদানরূপে গ্রহণ করে পয়ার ত্রিপদী ছন্দে সাধারণের হৃদয়ানুকূল করে সহজ সরল ভাষায়, স্বতোৎসারিত আবেগে ও গীতিসুরের মূর্ছনায় তাঁর কাব্যটিকে অপূর্ব সুন্দর রসমূর্তি দান করেছেন। তাছাড়া 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' ভাগবতের অনুবাদ না হয়ে ভাবানুবাদ হওয়ায় কাব্যটি অনেকাংশে মালাধর বসুর মৌলিক রচনার স্পর্শ মণ্ডিত। কবি সংস্কৃত ভাষায় পণ্ডিত ছিলেন। কিন্তু অনুবাদের ক্ষেত্রে সরলতাকেই রচনা বৈশিষ্ট্য করে তুলেছেন।

৬.২ মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্যে বাঙালিয়ানা

মালাধর বসুর 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' কাব্যের অপর এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য এর বাঙালিয়ানা এবং কবির বাঙালি মানসিকতা। ভাগবত পুরাণগ্রন্থ এবং এই পুরাণ গ্রন্থটির কাহিনি উত্তর ভারতের আর্য সমাজের কাহিনি, এর সঙ্গে বাংলাদেশ কিংবা বাঙালি সমাজের কোন সাক্ষাৎ সংস্রব নেই। ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় যথার্থ বলেন, ''শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে কাব্য লক্ষণ ততটা প্রকট না হলেও এ কাব্যের অনেক স্থানে বাঙালি মনোভাব সঞ্চারিত হয়েছে তা স্বীকার করতে হবে। এই কাব্যই প্রথম পুরাণের অনুসরণে লেখা আখ্যানকাব্য।... শ্রীকৃষ্ণ বিজয়ের সাহায্যে বাঙালি বৈষ্ণবসমাজ শ্রীমদ্ভাগবতের সঙ্গে পরিচিত হয়েছে, তাই গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতাদর্শের পটভূমিকারূপে শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের বিশেষ মূল্য স্বীকার করতে হবে'' (বাংলাসাহিত্যের ইতিবৃত্ত ঃ প্রথম খণ্ড)। এই প্রসঙ্গে একটি কথা বলা প্রয়োজন যে ঐ সময় মুসলমান আক্রমণের প্রবল আঘাতের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ, হিন্দুসমাজ অস্তিত্বরক্ষার প্রয়োজনে এগন ঐশ্বর্যবান আদর্শপুরুষের সন্ধান করছিল। কোন সন্দেহ নেই মালাধরের শ্রীকৃষ্ণচরিত্রের মধ্যে বাঙালি সমাজ ঐ জাতীয় বীর চরিত্রকেই প্রত্যক্ষ করেছে। তবে আমাদের মনে হয়, মালাধর ঠিক এই জাতীয় সমাজবাদী দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে তাঁর কাব্য পরিকল্পনা করেননি। তবে, ''ভাগবতে

মন্তব্য

কৃষ্ণের ঐশ্বর্যমিশ্রিত লীলাই প্রধান। মালাধরও কতকটা সেই আদর্শ অনুসরণ করেছেন। আমরা কৃষ্ণের যে মধুর লীলার কথা বলে থাকি তার অনেকটাই গৌড়ীয় ভক্তদের তৈরি, যার পশ্চাতে ছিল চৈতন্যদেবের প্রভাব" (ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত ঃ প্রথম খণ্ড)।

'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' কাব্যের এই জাতীয় তত্ত্বের প্রসঙ্গ বাদ দিলে কাব্যটির বহু জায়গায় বাঙালির রচিত মনোভাবেই প্রতিফলন ঘটেছে। কবি বৃন্দাবনের যে প্রাকৃতিক পরিবেশ অঙ্কন করেছেন, তাতে বাংলাদেশের আম-জাম-কাঁঠাল-সুপুরি বনের দীর্ঘ ছায়া ঘনীভূত। তাই দেখা যায়, অন্নপানের বর্ণনা অংশের অধিকাংশ জায়গায় ভাত খাওয়ার যে বর্ণনা আছে তাতে যশোদা বালক কৃষ্ণকে ডাক দিয়ে বলছেন, ''ভাত খায়্যা পুনরপি খেলহ আসিয়া।" এছাড়া অন্যান্য প্রসঙ্গেও যেমন— কৃষ্ণ গোচারণের জন্য বৃন্দাবনে অন্যান্য রাখাল বালকদেরকে ''সব ছওয়ালে ভাত কৃষ্ণ বাটিয়াত দিল।" আসলে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলায় বাঙালি বালকের জীবনলীলাই প্রতিফলিত হয়েছে। অন্যদিকে কবির উপমা ব্যবহার প্রসঙ্গে বাঙালি সমাজজীবনে ছায়া পতিত। কৃষ্ণ কর্তৃক কেশী দৈত্য বধের বর্ণনা কবি করেছেন, ''ফুটি কাঁকুড়ি জৈন হৈল খান খান।'' ফাটা কাঁকুড়ের এই বর্ণনায় বাংলাদেশই জীবন্ত। তাছাড়া মথুরার মালাকার একজন কৃষ্ণকে বালা দিলে তিনি তাকে বর দিলেন—

'উত্তম জাতি হৈল মালি কৃষ্ণের বরে।
জল আচরত যেন সংসার ভিতরে।।'

এই বর্ণনায় বাংলাদেশের 'জলচল' 'জল-অচল'-শূত্র সমাজের কথাই চিত্রিত। অন্যদিকে মথুরায় ''গোয়ানারিকেল দেখি দুয়ারে।" খগেন্দ্রনাথ মিত্র তাই মনে করেন, কৃষ্ণলীলাকে মালাধর বসু ''বাঙালির ছাঁচে ঢালিয়া সাজাইয়াছেন। তাঁহার বর্ণনায় দেখি শ্রীকৃষ্ণ সখাদের সহিত ভাত খাইতেছেন। মথুরায় গুয়া, জলপাই কামরাঙ্গার গাছ আছে, দুয়ারে দুয়ারে গুয়া, নারিকেল শোভা পাইতেছে।" বৃন্দাবনের প্রাকৃতিক শোভার বর্ণনায় তাই মালাধর বসু বাংলাদেশের মালতী, জাতি, পদ্ম, তুলসী, কুমুদ, কনকচাঁপা প্রভৃতি ফুলেরই উল্লেখ ঘটিয়েছেন। বৃক্ষের পরিচয় সূত্রেও উপস্থিত হয়েছে বাংলাদেশের পরিচিত বৃক্ষ— আমলকি, তমাল, নারিকেল, বাসক, পাকুড়, তাল রামগুয়া, শিমুল, পলাশ, জলপাই,কামরাঙা, খেজুর, অশ্বত্থ প্রভৃতি। ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

সেই কারণেই মন্তব্য করেন, ''কবি যদি বাংলাদেশের গাছপালা লতাপাতার দ্বারা বৃন্দাবন-দ্বারকাপুরীকে সাজাতে চান তাতে আপত্তির কিছু নেই। কৃত্তিবাস প্রসঙ্গে বলেছি, রায়াণের কবি বাংলাদেশের পটভূমিকা অনেক স্থলেই অবিকল গ্রহণ করেছেন। মালাধরও সেই একই আদর্শ অনুসরণ করেছেন।''

মন্তব্য

৬.৩ কবিপ্রতিভা ও কাব্যের মূল্যায়ন

মালাধর বসু মূলত ভক্ত, দ্বিতীয়ত কবি। তাই কৃষ্ণের মাধুর্য লীলার কথা বললেও কৃষ্ণের ঐশ্বর্য রূপকে তাঁর অনুবাদে বিশেষ মর্যাদা দিয়েছেন। অনুবাদের ক্ষেত্রে মালাধর ভাগবতের বিষয়কে পয়ার ত্রিপদী ছন্দে সাধারণের হৃদয়গ্রাহী করে তুলেছেন— 'লোক নিস্তারিতে যাই পাঁচালী রচিয়া।' তাছাড়া রাগানুগা ভক্তির পরোক্ষ প্রেরণা এই কাব্যে রয়েছে। মালাধর পরবর্তী ভাগবত অনুবাদকদেরও প্রভাবিত করেছেন।

তাঁর কাব্যে কবিত্বময় বর্ণনা কিংবা শিল্পচাতুর্যের প্রকাশ দুর্লক্ষ্য। কিন্তু সহজ, সরল, নিরলংকৃত ভাষায় কৃষ্ণের ঐশী শক্তির বর্ণনাই ছিল তাঁর মুখ্য পরিকল্পনা।

শ্রীকৃষ্ণের মথুরাগমনের পূর্বে গোপীদের হাহাকারের বর্ণনা ঃ

আর না যাইব সখি চিন্তামণি ঘরে।
আলিঙ্গন না করিব দেব গদাধরে।।
আর না দেখিব সখী সে চাঁদ বদন।
আর না করিব সখী সে মুখ চুম্বন।।

আসলে, সেদিনের যুগবাসনাই ছিল তাই। দুর্বল, পরাজিত, হতমান জাতির আন্তরিক আকাঙ্ক্ষাই ছিল এক গৌরবময়, বলবীর্যময় অতীত কাহিনির আস্বাদন, যার মধ্যে যুগাবতারের আবির্ভাবের আশ্বাস লক্ষ করা যায়। এই ঐতিহাসিক পটভূমিতেই 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের' রচনা।

শ্রীকৃষ্ণের বীরমূর্তি চিত্রিত করা ছিল কবির অভিপ্রায়। মালাধর ভাগবতের কৃষ্ণচরিত্রের হুবহু দিক তুলে না ধরে সমকালীন জীবনের রুচি ও চাহিদা অনুযায়ী পরিমিতিবোধের সঙ্গে কৃষ্ণের ঐশ্বর্যলীলার দিকটিই বেশি প্রকাশ করেছেন। এই কৃষ্ণ যেমন বীরত্বে অপরাজেয় তেমন প্রেমে মাধুর্যময়।

শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্যে বাঙালির জীবনপ্রকৃতির পরিচয় রয়েছে বলেই এই কাব্যটি

মন্তব্য

বাঙালির এত প্রিয়। বাংলার রীতি-নীতি, পারিবারিক ও সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান দৈনন্দিনজীবনের খাদ্য-সামগ্রীর স্বাদ— সমস্তই তাঁর কাব্যে সুন্দর ভাবে চিত্রিত।

মালাধর বসু তাঁর শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে যে ভক্তি লক্ষ করা যায়, তা ভাগবতে বর্ণিত বৈধী ভক্তি নয়, তা শাস্ত্রীয় ভক্তি। প্রাক্-চৈতন্য যুগের সাধারণ ভক্তির আদর্শ শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে উপস্থাপিত হয়েছে। যেমন, অর্জুনকে প্রদত্ত ব্যাসদেবের উক্তি— 'সর্ব্বভূত সম হরি সর্ব্ব ধর্ম্মময়।/সভার আকৃতি হরি উতপতি প্রলয়।'

কাব্যের আঙ্গিক বিচারে মালাধরের কৃতিত্ব খুব উজ্জ্বল নয়। পয়ার ত্রিপদী ছন্দেও খুব একটা কৃতিত্ব দেখাতে পারেননি। অলংকার প্রয়োগেও কবি গতানুগতিক। যেমন, উৎপ্রেক্ষা অলংকার ঃ

চৌদিকে গোপিনীগণ মধ্যে নন্দবালা।
পূর্ণিমার চাঁদ যেন উদয় ষোলকলা।।

শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে বাংলার তদানীন্তন দেশকালের ছায়াপাত ঘটেছে। যেমন, মথুরার যে মালাকর কৃষ্ণকে ফুলমালা দান করেছিল, সে কৃষ্ণের বরে 'জলচল' জাতি হল—

উত্তম জাতি হৈল মালি কৃষ্ণের বরে।
জল আচরএ যেন সংসার ভিতরে।।

এখানে শূদ্র সমাজের কথা বলা হয়েছে। কাব্য সমাপ্তিতে কবি যুগধর্ম ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন—

ম্লেচ্ছ জাতি রাজা হব অধর্ম্ম পালিব।
জার ধন দেখিব তার সব হরি লব।।

এই বর্ণনার মধ্যে তৎকালীন পাঠান শাসনকালের বিশৃঙ্খলাকে নির্দেশ করতে চেয়েছেন কবি।

মালাধরের কাব্যটি গৌড়ীয় বৈষ্ণব তাপর্যপূর্ণ। চৈতন্যদেব ও তাঁর শিষ্যেরা এজন্য গ্রন্থটিকে বিশেষ মর্যাদা দিয়েছেন। পরবর্তীকালের বৈষ্ণবধর্মের বিকাশে এই গ্রন্থের অবদান অনস্বীকার্য।

৬.৪ শ্রীকৃষ্ণ বিজয় মালাধর বসুর স্বাধীন রচনা

মন্তব্য

'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' কাব্যটিকে মধ্যযুগের বাংলাসাহিত্যের অনুবাদ শাখার অন্তর্গত করা হলেও মালাধর বসু যে তাঁর কাব্যে ভাগবতকে হুবহু অনুবাদ করেননি, কোথাও কোথাও অনুসরণ করেছেন আবার কোথাও বা অতিক্রমের ইঙ্গিতও আছে। মালাধর বসু তাঁর কাব্যের সূচনাতেই বলেছেন— ''ভাগবত অর্থ যত পয়ারে বাঁধিয়া।/লোক নিস্তারিতে করি পাঁচালি রচিয়া।।/সুনহে পণ্ডিত লোক একচিন্ত মনে। কলি ঘোর তিমির জাগে বিমোচনে।।/ভাগবত শুনি আমি পণ্ডিতের মুখে।/লৌকিক কহিল লোক শুন মহাসুখে।।''

সুকুমার সেনের মতে, 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের গোড়ার দিকে প্রধানত ভাগবত অনুসারেই কৃষ্ণলীলা আদ্যন্ত বিধৃত হইয়াছে। শেষের দিকে মাঝে মাঝে হরিবংশ অনুসৃত হইয়াছে। কবি বলেছেন যে তিনি পণ্ডিতের মুখে ভাগবত পুরাণ শুনে এবং ব্যাসদেবের স্বপ্নাদেশ পেয়ে কাব্যকর্মে হাত দিয়েছেন। পণ্ডিতের মুখে শোনা শ্রীকৃষ্ণ প্রসঙ্গ মধ্যে হরিবংশের ও বিষ্ণুপুরাণের বিবরণও কিছু শোনা যায়। সেজন্য গুণরাজের কথিত কাহিনী আদ্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে ভাগবতের অনুগামী নয়। খানিকটা কবির স্বাধীন রচনা। যেখানে মূলকে অনুসরণ করেছেন সেখানে তাঁকে বেশ সংক্ষেপে সারতে হয়েছে। সেজন্যও শ্রীকৃষ্ণবিজয়কে ভাগবতের অনুবাদ বলা সঙ্গত নয়, অনুসারী বলা উচিত। ভাগবত সহজ বই নয়, পণ্ডিতবোধ্য এবং পণ্ডিত-রচিত। তাকে মালাধর বাংলা রূপ দিয়েছেন। সেজন্য সংস্কৃতে যেসব বাঁধাধরা বর্ণনা ও উক্তি এবং অভিভাষণ ও বহুভাষণ আছে তা খাপ খাবেনা বলে বাদ দিয়েছেন অথবা বদলেছেন।

মালাধর বসু ভাগবতের দশম ও একাদশ স্কন্ধ ছাড়াও প্রথম, ষষ্ঠ ও দ্বাদশ স্কন্ধেরও প্রত্যক্ষভাবে বিশেষ সাহায্য গ্রহণ করেছিলেন।

ভাগবত ছাড়াও মহাভারত, হরিবংশ, বিষ্ণুপুরাণ, ভবিষ্যপুরাণ ও ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের নামোল্লেখ করা যায়, কিছু কিছু কাহিনী শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্যে সাধারণভাবে অনুসৃত হতে দেখা যায়। তবে, ভাগবতের কৃষ্ণকথা উপস্থাপনই যে তাঁর প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ বা সংশয় থাকার কোন অবকাশও নেই। সমগ্র কাব্যে সহস্রাধিক স্থলে ভাগবতের হুবহু আক্ষরিক অনুবাদই তার সুস্পষ্ট প্রত্যক্ষ প্রমাণ বহন করছে।

মন্তব্য

এই কাব্যের পরিচয় কেবল ভাগবতের অনুবাদরূপেই চিহ্নিত হতে পারে না। মূল ভাগবতের আড়ম্বরপূর্ণ, অলঙ্কারবহুল, পণ্ডিতি বাক্‌চাতুর্য অশিক্ষিত ক্ষীণপ্রাণ বাঙালির উপর জোর করে চাপিয়ে দিতে চাননি মালাধর বসু। বস্তুতপক্ষে মালাধর ভাগবতের যতটুকু অংশের অনুবাদ করেছেন তাকেও একপ্রকার সারানুবাদ বলে উল্লেখ করাই হবে যুক্তিসঙ্গত। যথাসম্ভব সংক্ষেপে কৃষ্ণের জন্ম থেকে তনুত্যাগ পর্যন্ত কৃষ্ণলীলার সামগ্রিক পরিচয় প্রদানই ছিল মালাধরের মুখ্য উদ্দেশ্য। তাই ভাগবতের বেশ কয়েকটি উপকাহিনী মালাধর তাঁর কাব্যের মূল কাহিনীর পক্ষে অপ্রয়োজনীয় বিবেচনায় পরিত্যাগ করেছেন। দার্শনিক আলোচনারও অনেক অংশ বর্জন বা সংক্ষেপন করেছেন এবং ভাগবত বহির্ভূত অন্যান্য পুরণাদি থেকে প্রসঙ্গত কিছু কিছু অংশ সংযোজিত করে কাব্যের পূর্ণতা সম্পাদনে সচেষ্ট হয়েছেন। এইসবকারণে সহজেই বলা যায় শ্রীকৃষ্ণবিজয় একান্তভাবে ভাগতের অনুবাদগ্রন্থ না হয়ে তা হয়ে উঠেছে কবি মালাধরের রচিত এক স্বতন্ত্র সম্পূর্ণ কৃষ্ণকথাকাব্য।

শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে কংস-দৈবকীর গর্ভজাত ছয়টি সন্তানকে জন্মের পরপরই একটি একটি করে হত্যা করেননি। ভাগবতে আছে ছয়পুত্রের জন্মের পর পরই কংস তাদের একে একে হত্যা করেন।

শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে কৃষ্ণের আবির্ভাবের বিবরণ অতিশয় লৌকিক। কিন্তু ভাগবতে কৃষ্ণের আবির্ভাব আধ্যাত্মিক বাতাবরণে অলৌকিক।

ভাগবতের দশম স্কন্ধের তৃতীয় অধ্যায়ের বাসুদেব ও দৈবকী কর্তৃক কৃষ্ণের দীর্ঘবন্দনা শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে অতিশয় সামান্য। সদ্যপ্রসূত শিশুকৃষ্ণকে নন্দালয়ে নিয়ে যাবার সময় একটি শৃগালের যমুনা পার হয়ে বাসুদেবকে পথ দেখানোর কথা ভাগবতে নেই।

পুত্রোৎসবে গোপরমণীগণের বিস্তৃত বর্ণনা মালাধর তাঁর কাব্যের মূল কাহিনীর পক্ষে অত্যাবশ্যক বিবেচনা না করে যথার্থ পরিমিতি বোধের পরিচয় দিয়েছেন।

শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের কাহিনী তিনটি স্তর পর্যয়ে বিন্যস্ত। আদিকাহিনী কৃষ্ণের জন্ম থেকে বৃন্দাবনলীলার সমাপ্তি বা তাঁর মথুরাগমনের পূর্বপর্যন্ত বিস্তৃত। মধ্যকাহিনীতে বর্ণিত হয়েছে মথুরায় কংসবধ থেকে দ্বারকাগমনের পূর্বপর্যন্ত ঘটনা। অন্ত্যকাহিনীতে সবান্ধব দ্বারকাপুরীতে যাত্রা থেকে দ্বারকা ধ্বংস ও কৃষ্ণের ইহলোক ত্যাগের কাহিনি বিবৃত।

কৃষ্ণলীলায় ঐশ্বর্য ও মধুরভাবের মধ্যে ঐশ্বর্যভাবের প্রকাশই প্রাচীন। মধুরভাব অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালের নিবেদন। মালাধর তাঁর কাব্যে সেই ঐশ্বর্যভাবটিকেই মুখ্যত অবলম্বন করে ও প্রাধান্য দিয়ে ভাগবতের প্রতি যথার্থ আনুগত্যেরই প্রত্যক্ষ প্রমাণ রেখেছেন। যেখানে ঐশ্বর্যভাবে প্রকাশের তেমন সুযোগ নেই সেখানে মধুর ভাব প্রকাশের অবকাশ কবি দেখিয়েছেন। আর ঐশ্বর্যভাব অধিকতর পরিস্ফুট করে তুলতে মালাধর তাঁর কাব্যে ভাগবতবহির্ভূত ঘটনার সন্নিবেশ ঘটাতেও যে কোথাও কোথাও কোনো দ্বিধা করেননি তারও প্রমাণ মেলে।

বাৎলস্য মধুর বা করুণরসের বাড়াবাড়ি মালাধরের কাব্যে কোন সময়েই তেমনভাবে প্রকাশ পায়নি। ভাগবতের যেসব অধ্যায়ে এইসকল রসের অবতারণা ঘটেছে, মালাধর অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যথেষ্ট সেচতনভাবেই তাঁর লেখনীকে মূলের স্রোতে না ভাসিয়ে সংযত ও সংহত করেছেন। যার ফলে মূল ভাগবতকাহিনী এই সকল স্থলে অনেক ক্ষেত্রেই সংক্ষেপিত কোথাওবা কিঞ্চিত রূপান্তরিত হয়েছে।

মালাধর তাঁর কাব্যের গোপী প্রসঙ্গের কথা ও রামলীলার কাহিনী অনেক সংক্ষেপিত আকারে উপস্থাপিত করেছেন। আদিরসাদি বর্ণনায় শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের কবির রচনায় অত্যুৎসাহের তেমন লক্ষণ খুঁজে পাওয়া যায়না।

ভাগবতে কৃষ্ণের মথুরা যাত্রাকালে গোপীদের বিলাপ ও ক্রন্দন দীর্ঘায়িত হলেও শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে সংক্ষেপিত। বীররস প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনে শুধু সংক্ষেপকরণ নয়, কোথাও কোথাও মালাধর দশম স্কন্ধের এক-একটা পুরো অধ্যায়ই পরিত্যাগ করেছেন স্বীয় কাব্যের কাহিনীটিকে সংহত রূপ দেবার প্রয়োজনে। এই প্রসঙ্গে দশম স্কন্ধের পঁয়ত্রিশ অধ্যায়টির কথা উল্লেখ করতে পারি। বেনুবাদক কৃষ্ণ নয়, অসুরনিধনকারী বীরশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণের প্রতিই মালাধরের কৌতুহল এবং আকর্ষণ।

জলাধিষ্ঠাতা বরুণের মুখ দিয়ে পরমপুরুষার্থ কৃষ্ণের মহিমার প্রকাশ ঘটেছে ভাগবতে দশম স্কন্ধের অষ্টাবিংশ অধ্যায়ে। মালাধরের লক্ষও কৃষ্ণের মহিমা প্রতিষ্ঠা। ভাগবতে যে অংশ সংক্ষিপ্ত মালাধর সে কাহিনীর কিছু বিস্তার ঘটিয়ে ঘটনাটিকে পাঠকের কাছে আরও সত্য ও বিশ্বাসযোগ্য করে তুলেছেন। ফলে, মালাধরের হাতে কাহিনী আরও জীবন্ত এবং বরুণদেবের সংলাপে তাঁর চরিত্রটিও অধিকতর বাস্তবানুগ হয়ে উঠেছে।

মন্তব্য

কবির উদ্দেশ্য জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে কৃষ্ণের মহিমা ও ঐশ্বর্যের প্রকাশ ঘটানো। তবে তাকে এমন একটি ঘরোয়া পারিবারিক কাহিনীর পরিকাঠামোয় দাঁড় করিয়েছেন যার ফলে সমস্ত উদ্বেগ উৎকণ্ঠাও পাঠকের কাছে অনেকখানি বিশ্বাসযোগ্যতা লাভ করতে সমর্থ হয়েছে। ভাগবতে দশম স্কন্ধের ষোড়শ অধ্যায়ে কৃষ্ণকর্তৃক কালীয় দমনের কাহিনীর আছে। ভাগবতে দেখি কালীহ্রদের তীরে নন্দ-যশোদার সঙ্গে বিলাপকাতর গোপীরাও রয়েছে। এই ঘটনা শ্রীকৃষ্ণবিজয়েও আছে। কিন্তু সেখানে নন্দ-যশোদা ইত্যাদি উল্লেখ থাকলেও গোপীদের উল্লেখ নেই।

কৃষ্ণের ঐশ্বর্যভাব পরিস্ফুটনে মালাধর কখনো কখনো ভাগবতের বহির্ভূত ঘটনারও সমাবেশ ঘটিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে কৃষ্ণের বিশ্বরূপ প্রদর্শনীর কথা উল্লেখ করা যায়। যা, ভাগবতে নেই। ভাগবতগীতার দ্বারা এই অংশে মালাধর প্রভাবিত বলে মনে করা হয়ে থাকে। ফলে, তিনি যে গীতার গুরুত্ব অস্বীকার করেননি তারও নিদর্শন পাওয়া যায়।

মালাধরের কাব্যে ভাগবতকে অতিক্রমের উদাহরণ আরও আছে। শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের অন্তর্গত বজ্রভাব উপাখ্যান ভাগবতে নেই। রাম-চরিতের প্রতিও যে মালাধরের সানুরাগ আকর্ষণ ছিল কাব্যের এই অংশে তার প্রমাণ মেলে। বজ্রলাভের কাহিনি হরিবংশে আছে।

ভাগবতে পারিজাতহরণ প্রসঙ্গ খুবই সংক্ষিপ্ত। কিন্তু মালাধর ভাগবতের এই অংশের বিপুল বিস্তার ঘটান। বিষ্ণুপুরাণ বা হরিবংশে পারিজাত হরণের কাহিনী বিস্তৃত আকারেই আছে।

খগেন্দ্রনাথ মিত্রের মতে, ‘‘কোথাও তিনি মূলের আনুগত্য করিয়াছেন, কোথাওবা বাদ দিয়েছেন, কোথাও ভাগবতের উপরেও রঙ ফলাইয়াছেন তাহা না জানিলে মালাধরের কাব্যের প্রকৃত মূল্য আমরা দিতে পারিব না।’’

গীতা চট্টোপাধ্যায় তাঁর ভাগবত ও বাংলা সাহিত্য’ গ্রন্থে বলেছেন- গুণরাজের গ্রন্থে ভাগবত কোথাও গৃহীত, কোথাওবা অতিক্রান্ত আবার কোথাওবা নবীভূত। অর্থাৎ অনুবাদক অপেক্ষা স্রষ্টা শিল্পীর ভূমিকাই এখানে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ।

বঙ্গীয় পাঠক সমাজের নিকট ভাগবতের কৃষ্ণকথা উপস্থাপন করাই গুণরাজখান তথা মালাধর বসুর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। একইসঙ্গে অনুবাদের আনুগত্যে আবার কাব্যনির্মাণের স্বাতন্ত্র্যে মধ্যযুগের বাংল সাহিত্যে তিনি এক স্বতন্ত্র বিশিষ্ট কবিরূপে

চিহ্নিত হয়ে থাকবেন। মন্তব্য

৬.৫ আত্মমূল্যায়নধর্মী প্রশ্ন

১। মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্যের কোন শ্লোকটি শ্রীচৈতন্যদেবকে অত্যন্ত মুগ্ধ করেছিল?

২। শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্যের বিজয় শব্দটির তাৎপর্য কি?

৩। শ্রীকৃষ্ণবিজয়কে কেন গোবিন্দমঙ্গল বলা হয়?

৪। মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্যে বাঙালিয়ানা উল্লেখ করো।

৫। মালাধর বসুর কবি প্রতিভা ও কাব্য মূল্যায়ন আলোচনা করো।

৬। অনুবাদক হিসাবে মালাধর বসুর কৃতিত্ব আলোচনা করো।

৭। শ্রীকৃষ্ণবিজয় মালাধর বসুর স্বাধীন রচনা কিনা আলোচনা করো।

৬.৬ সহায়ক পঞ্জী

১। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত - অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

২। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস - দেবেশ আচার্য।

৩। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস - ড. ক্ষেত্র গুপ্ত।

৪। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস - শ্রীমন্ত কুমার জানা।

একক - ৭ ভাগবত অনুবাদ কম হওয়ার কারণ, অনুবাদক হিসেবে মালাধর বসুর বিশেষত্ব, মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্যে ভক্তি প্রসঙ্গ, মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে ঐশ্বর্যলীলাই মুখ্য মধুর লীলা গৌণ।

বিন্যাসক্রম-

৭.১ ভাগবত অনুবাদ কম হওয়ার কারণ

৭.২ অনুবাদক হিসেবে মালাধর বসুর বিশেষত্ব

৭.৩ শ্রীকৃষ্ণ বিজয় কাব্যে ভক্তি প্রসঙ্গ

৭.৪ শ্রীকৃষ্ণ বিজয়ে ঐশ্বর্যলীলাই মুখ্য মধুরলীলা গৌণ

৭.৫ আত্মমূল্যায়নধর্মী প্রশ্ন

৭.৬ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

৭.১ ভাগবত অনুবাদ কম হওয়ার কারণ

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের একটি বড় অংশ অনুবাদ সাহিত্যের ধারায় পুষ্ট। সংস্কৃত রচিত রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত এবং অন্যান্য পুরাণ গ্রন্থের বাংলা ভাষায় অনুবাদ এই অনুবাদ সাহিত্যের বিষয়। কৃত্তিবাসী ও কাশীদাসী মহাভারত প্রাচীনকাল থেকে আজ পর্যন্ত উঁচু-নীচু, শিক্ষিত-অশিক্ষিত নিরপেক্ষভাবে সমানভাবে জনপ্রিয়। কারণ বাংলার লোকপ্রিয় এই দুই কবি বাঙালির রুচি ও মানসিকতা অনুযায়ী তাঁদের কাব্যের পরিকল্পনা করেছেন। অন্যদিকে ভাগবত বৈষ্ণব ধর্ম ও সাহিত্যের প্রধান আশ্রয় হলেও চৈতন্যযুগে ভাগবতের অনুবাদ জনসাধারণের চিত্তে সীমাহীন সাড়া জাগিয়ে তুলতে পারেনি। এর কারণ ভাগবত মূলতঃ প্রচারধর্মী কাব্য। তাই শিল্প সৌন্দর্যের বিচারে রামায়ণ মহাভারতের নৈকট্যলাভের দাবি তার নেই। তাছাড়া ভাগবত প্রধানতঃ বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের গ্রন্থ। কিন্তু রামায়েত গোষ্ঠীর জন্য লেখা কাব্য রামায়ণ নয়। আর কাশীরামের মহাভারতে বৈষ্ণব ভক্তির সুর বাজলেও মহাকাব্যটির নিজস্ব কাহিনি ও চরিত্রগৌরব তাকে সর্বাংশে ছাপিয়ে উঠেছে। ভাগবত বিশাল কাব্য হলেও বৈচিত্র্যের অভাব এর জনপ্রিয়তা হ্রাসের অন্যতম কারণ। অন্যদিকে ভাগবতের কৃষ্ণ শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী-কৃষ্ণ। কিন্তু চৈতন্য আবির্ভাবের পর বাঙালি মানসে কৃষ্ণ হলেন প্রেমের দেবতা, রাধা-রমণ। এই চিরকিশোর কৃষ্ণকে বাঙালি পেয়েছে বৈষ্ণব কবিতায়,

ভাগবতে নয়। এই কারণেও ভাগবত জনচিত্ত জয়ে অসমর্থ। মন্তব্য

বৈষ্ণব ভক্তিবাদের উৎস ও ভাবাদর্শের দার্শনিক আশ্রয়স্থল হিসেবেই বাঙালি সমাজে ভাগবতের স্থান। তাই রামায়ণ মহাভারতের মত ভাগবত প্রবচনে, প্রাত্যহিক জীবনে বাঙালির জীবন সংস্কারে পরিণত হয়ে তার অস্থিমজ্জায় মিশে যেতে পারেনি। অন্যদিকে ভাগবতে রাধাপ্রসঙ্গ না থাকাটাও এর জনপ্রিয়তা হ্রাসের অন্যতম প্রধান কারণ। তাছাড়া রামায়ণ-মহাভারতের আখ্যান তার সরলতার গুণে যেমন জনসাধারণের হৃদয়গ্রাহী হয়েছে; তেমনি কাব্য প্রচারিত ভক্তিবাদ যাবতীয় তত্ত্ব অতিক্রম করে চিত্তজয়ে সমর্থ হয়েছে। কিন্তু ভাগবতে কাহিনি গৌণ, তত্ত্বের আবেদন মুখ্য। তাই জনসাধারণ এই কাব্যের রসপ্রাপ্তির জন্য বাংলা অনুবাদের ক্ষেত্রেও পণ্ডিতের মুখাপেক্ষী হয়ে থেকেছে। এই বিশেষ কারণেই কৃত্তিবাস ও কাশীরামের মত কোন প্রতিভাধর কবি ভাগবত অনুবাদে আবির্ভূত হননি। এই উন্নত কবি প্রতিভার অভাবেই অনুবাদ সাহিত্যের ধারায় ভাগবত অনুবাদ তেমন পুষ্টিলাভ করেনি। সর্বোপরি রামায়ণ মহাভারতের তুলনায় ভাগবতের স্বল্প সংখ্যক পুঁথিই প্রমাণ করে ভাগবতের জনপ্রিয়তা সেকালে যথেষ্টই কম ছিল। তাছাড়া রামায়ণ-মহাভারতে কাব্যরসের যে বিপুল প্রবাহ আছে, ভাগবত অনুবাদ এই ব্যাপারে অনেক দূরে অবস্থিত। এই সব কারণেই রামায়ণ-মহাভারতের অনুবাদের তুলনায় ভাগবতের অনুবাদ এত কম।

৭.২ অনুবাদক হিসেবে মালাধর বসুর বিশেষত্ব

তোমার কা কথা তোমার গ্রামের কুক্কুর।
সেহো মোর প্রিয় অন্য জন বহু দূর।।

কুলীন গ্রামের মালাধর বসু সম্বন্ধে চৈতন্যদেবের উপরিউক্ত প্রশস্তির কথা কৃষ্ণদাস কবিরাজ 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে' উল্লেখ করেছেন। ভাগবতের অনুবাদক মালাধর বসুর প্রতি চৈতন্যদেবের এই শ্রদ্ধা মূলত কৃষ্ণনিষ্ঠা ও বৈষ্ণবভক্তির কারণে। মালাধর বসু ভাবতের দশম ও একাদশ স্কন্ধের অনুবাদ করে প্রাক্-চৈতন্য যুগে অনুবাদক হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন।

এক, ভাগবতের দশম স্কন্ধ এবং একাদশ স্কন্ধের অংশবিশেষ অনুবাদ করেছেন কবি। তাছাড়া ভাগবত বহির্ভূত বিষ্ণুপুরাণ ও হরিবংশের কাহিনি অনুসরণে বৃন্দাবন

মন্তব্য

লীলা, রাসলীলা, দানলীলা ও নৌকালীলা গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তাছাড়া লোকসমাজে প্রচলিত রাধাকৃষ্ণের লৌকিক প্রণয়লীলাও তাঁর গ্রন্থে স্থান পেয়েছে।

দুই, মালাধর বসু তাঁর কাব্যে তিনটি ধারায় কাহিনি বিন্যাস করেছেন— বৃন্দাবনলীলা, মথুরালীলা, দ্বারকালীলা।

তিন, মালাধর বসু মূল ভাগবতের হুবহু অনুবাদ করেননি, করেছেন মর্মানুবাদ।

চার, মালাধর বসু মূলত ভক্ত, দ্বিতীয়ত কবি। তাই কৃষ্ণের মাধুর্য লীলার কথা বললেও কৃষ্ণের ঐশ্বর্য রূপকে তাঁর অনুবাদে বিশেষ মর্যাদা দিয়েছে।

পাঁচ, অনুবাদের ক্ষেত্রে মালাধর ভাগবতের বিষয়কে পয়ার ত্রিপদী ছন্দে সাধারণের হৃদয়গ্রাহী করে তুলেছেন— 'লোক নিস্তারিতে গাহি পাঁচালী রচিয়া।'

ছয়, তাঁর কাব্যে কবিত্বময় বর্ণনা কিংবা শিল্পচাতুর্যের প্রকাশ দুর্লক্ষ্য। কিন্তু সহজ, সরল, নিরলংকৃত ভাষায় কৃষ্ণের ঐশী শক্তির বর্ণনাই ছিল তার মুখ্য পরিকল্পনা।

সাত, এক ঐতিহাসিক পটভূমিতেই শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের রচনা। কারণ সেদিনের দুর্বল, পরাজিত, হতমান জাতির আন্তরিক আকাঙ্ক্ষাই ছিল এক গৌরবময়, বলবীর্যময় অতীত কাহিনির আস্বাদন, যার মধ্যে যুগাবতারের আবির্ভাবের আশ্বাস লক্ষ করা যায়।

আট, কাব্যসমাপ্তিতে কবি যুগধর্ম ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন ঃ

ম্লেচ্ছ জাতি রাজা হব অধর্ম্ম পালিব।
জার ধন দেখিব তার সব হরি লব।।

তৎকালীন সমাজে পাঠান শাসনকালের সামাজিক বিশৃঙ্খলা এই উক্তির মধ্যে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

নয়, মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে যে ভক্তি লক্ষ করা যায়, তা ভাগবতে বর্ণিত বৈধীভক্তি,আত্মনিবেদনমূলক গৌড়ীয় বৈষ্ণবভক্তি নয়, বরং প্রাক্-চৈতন্য যুগের সাধারণ ভক্তি। তাই তিনি তাঁর কাব্যে বলেছেন ঃ

কৃষ্ণের চরিত্র নর শুন একমনে।
কলি ঘোর তিমির করিত বিমোচনে।।
হেন কথা শুনিবারে না করিহ হেলা।

ভবসিন্ধু তরিবারে এই মাত্র ভেলা।। মন্তব্য

দশ, মালাধর ভাগবতের কৃষ্ণ চরিত্রের হুবহু দিক তুলে না ধরে সমকালীন জীবনের রুচি ও চাহিদা অনুযায়ী পরিমিতিবোধের সঙ্গে কৃষ্ণের ঐশ্বর্যলীলার দিকটিই বেশি প্রকাশ করেছেন। এই কৃষ্ণ যেমন বীরত্বে অপরাজেয় তেমন প্রেমে মাধুর্যময়।

এগারো, শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্যে বাঙালির জীবন প্রকৃতির পরিচয় রয়েছে এবং তাই কাব্যটি বাঙালির প্রিয়। বাংলার রীতি-নীতি, পারিবারিক ও সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান, দৈনন্দিন জীবনের খাদ্য-সামগ্রীর স্বাদ প্রভৃতি তাঁর কাব্যে সুন্দর ভাবে চিত্রিত।

বারো, কাব্যটিতে যে 'নন্দ নন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ' বাক্যটি রয়েছে, যা চৈতন্যদেবকে মুগ্ধ করেছিল। এই বাক্যের 'প্রাণনাথ' শব্দটি পরবর্তী কালের বৈষ্ণব ভক্তদের মনে রাগানুগাসাধনার আভাস দান করেছিল বলে করেছিল বলে অনুমান করা হয়। কৃষ্ণদাস কবিরাজও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এক জায়গায় বলেছেন—

কুলীন গ্রামের ভাগ্য কহনে না যায়।
শূকর চরায় ডোম সেহ কৃষ্ণ গায়।।

সুতরাং মালাধর বসু ভাগবতের শক্তিমান অনুবাদক না হলেও, মৌলিক কল্পনা প্রয়োগের ক্ষেত্রে, সহজ সরল রচনা রীতিতে ও কাহিনি বর্ণনার মাধুর্যে এবং মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে ভক্তের রচিত প্রথম কাব্য হিসেবে শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের গুরুত্ব অপরিসীম।

৭.৩ শ্রীকৃষ্ণ বিজয় কাব্যে ভক্তি প্রসঙ্গ

মালাধর বসুর 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' কাব্যের মূল বিষয়বস্তু শ্রীকৃষ্ণের জীবনবৃত্তান্ত। অন্যদিকে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মানুসারে 'শ্রীমদ্ভাগবত' মূলত ভক্তিরসের কাব্য। বাংলাদেশে আবার কৃষ্ণভক্তির দুটি ধারা লক্ষ্য করা যায়। প্রথম ধারাটি ঐশ্বর্য ভাবনাময়, অর্থাৎ কৃষ্ণ এই পর্যায়ে ভক্তের প্রভু। দ্বিতীয় ধারাটি মধুর রসাত্মক, এখানে কৃষ্ণ ভক্তের প্রেমিক কিংবা সখা। এই দ্বিতীয় ধারাটি বিকাশ এবং দার্শনিক পরিমণ্ডল গড়ে ওঠে চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পর। মালাধরের কাব্যে তাই যে ভক্তি লক্ষ্য করা যায়, তা ভাগবত অনুসারী বৈধীভক্তি গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের 'রাগানুগা' ভক্তি নয়। কবির বর্ণনাতেও এই বৈধী ভক্তিরই সমর্থন মেলে—

মন্তব্য

কৃষ্ণের চরিত্র নর সুন একমনে।
কলিমোর তিমির করিতে বিমোচনে।।
হেন কথা শুনবারে না করিহ হেলা।
ভবসিন্ধু তরিবারে এইমাত্র ভেলা।।'

শ্রীভূদেব চৌধুরীরও অভিমত হ'ল, ''স্বভাবতই মালাধর বসুর কৃষ্ণ-ভক্তির মধ্যেও ঐশ্বর্যবুদ্ধির প্রখরতা ছিল। বরং একজন স্মার্ত পৌরাণিক নিষ্ঠাবান হিন্দুর সমুচি সশ্রদ্ধতা নিয়েই তিনি কৃষ্ণের ঈশ্বরসত্তার শক্তি-প্রচুর মহিমা গাথা রচনা করেছেন। এখানেই কবির লেখনী-মুখে, হয়ত বা অজ্ঞাতেই, তাঁর সমসাময়িক যুগবাসনার আগ্রহ আপন থেকেই প্রকাশিত হয়েছে'' (বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা ঃ ১ম পর্যায়)। আসলে চৈতন্য আবির্ভাবের আগে মাধবেন্দ্রপুরী যেমন বাংলাদেশে ভাগবত প্রচার করেছিলেন, সরল বাংলা ভাষায় মালাধর বসুও সেই পথেই ভাগবত প্রচারে মনোযোগী হয়েছিলেন। তবে 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' কাব্যটির মধ্য দিয়েই বাঙালি সমাজ ভাগবত ও কৃষ্ণলীলার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পেয়েছিল। কবি মালাধর সুর কবিকৃতির এই ঐতিহাসিক মর্যাদা সার্থক স্বীকৃতি লাভ করে চৈতন্যদেবের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার মধ্য দিয়ে। যার উল্লেখ কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্যচরিতামৃতে' মেলে—

''গুণরাজখান কৈল শ্রীকৃষ্ণবিজয়।
তাঁহা এক বাক্য আছে মহা প্রেমময়।।
'নন্দের নন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ।'
এই বাক্যে বিকাইলাম তার বংশের হাথ।।
তোমার কা কথা তোমার গ্রামের কুক্কুর।
সেও মোর প্রিয় অন্যজন বহুদূর।।''

'নন্দের নন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ' এই বাক্যটিকে কেন্দ্র করে মহাপ্রভুর যে প্রেমবিহ্বল চিত্ত আবেগব্যাকুল হয়ে পড়েছিল, সেই পথ ধরেই পরবর্তীকালের গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের রাগানুগা ভক্তির দৃষ্টি 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' কাব্যটিকে বাংলা সাহিত্যে অমরত্ব দান করে।

৭.৪ শ্রীকৃষ্ণ বিজয়ে ঐশ্বর্যলীলাই মুখ্য মধুরলীলা গৌণ

মন্তব্য

মালাধর বসু ভাগবতের দশম ও একাদশ স্কন্ধের কাহিনীসূত্র অবলম্বন করে শ্রীকৃষ্ণ বিজয় কাব্যটি রচনা করেছিলেন। ঐ দুই স্কন্ধে— দশম স্কন্ধে কৃষ্ণের জন্ম থেকে দ্বারকালীলা পর্যন্ত বর্ণিত এবং একাদশ স্কন্ধে যদুকুল ধ্বংস ও কৃষ্ণের তনুদেহ ত্যাগ প্রধান ঘটনা। অবশিষ্টাংশে কৃষ্ণ ও উদ্ধবের কথোপকথনের সাহায্যে মুক্তি, ধ্যানযোগ, শ্রীহরির বিভূতি, যতিধর্ম, জ্ঞান-কর্ম-ভক্তিযোগ প্রভৃতি বর্ণিত হয়েছে। মালাধর মূলভাগবত ছাড়াও বিষ্ণুপুরাণ ও হরিবংশ থেকেও কিছু কিছু কাহিনী তাঁর গ্রন্থে অনুসরণ করেছেন।

মালাধর বসু শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে কৃষ্ণের বৃন্দাবন লীলা, মথুরলীলা ও দ্বারকালীলা অনুসরণ করেছেন। বৃন্দাবনলীলায় রাস, নৌকালীলা, দানলীলা প্রভৃতির যে বর্ণনা দিয়েছেন তা ভাগবত বহির্ভূত। অনেকের মতে পরবর্তীকালের এটি প্রক্ষেপ। মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণবিজয় চৈতন্যদেবকে তুষ্ট করত। মহাপ্রভু মালাধর বসুর এই কাব্যপাঠে এমন অভিভূত হয়েছিলেন যে তিনি কবির গ্রামটিকেও মাথায় তুলে রেখেছিলেন—

"প্রভু কহে কুলীন গ্রামের যে হয় কুক্কুর।
প্রিয়তর অন্যে বহুদ্দর।।"

কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচলিত মতবাদে পাই— 'কান্তা প্রেম সর্বসাধ্য যার।' অর্থাৎ ঐশ্বর্যলীলা নয়, ভক্ত ও ভগবানের মধ্যে কোন দূরত্ব থাকা ঈশ্বর পছন্দ করেন না। তিনি কান্ত ভক্ত কান্তা। তবু শ্রীচৈতন্য শ্রীকৃষ্ণবিজয়কে কেন মস্তকে স্থান দিয়েছেন তা ভেবে দেখার বিষয়। কারণ শ্রীকৃষ্ণ বিজয়ে ঐশ্বর্যলীলাই মুখ্য।

খ্রীস্টীয় ১৪৯ শতাব্দীর দিকে মাধবেন্দ্রপুরী বাংলাদেশে কৃষ্ণ প্রেমাত্রিত ভাগবত প্রচার করেন। অবশ্য লোকজীবনে কৃষ্ণলীলা কথার যে প্রচার ছিল না, তা নয়, তবে, মাধবেন্দ্রপুরীই বাংলাদেশে প্রথম ভাগবত প্রচার করেন। তা মূলত: ভাগবত পুরাণের দশম-একাদশ-দ্বাদশ স্কন্ধেই সীমাবদ্ধ ছিল। মালাধর বসু পঞ্চদশ শতাব্দীর কবি। তিনি ভাগবতের যে অংশকে অবলম্বন করেছেন তা কৃষ্ণের জন্ম থেকে অন্তলীলা পর্যন্ত প্রসারিত। তাঁর কাব্যের নাম 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়'। বিজয় কথাটির অর্থ কীর্তিকথা বা বিজয়গৌরব। দেব মাহাত্ম্যসূচক। মালাধর বসু তাঁর গ্রন্থ রচনার কারণ সম্পর্কে জানিয়েছেন—

মন্তব্য

''ভাগবত শুনিল আমি পণ্ডিতের মুখে।
লৌকিকে কহিয়ে সার বুঝ মহাসুখে।।
ভাগবত অর্থ যত পয়ারে বান্ধিয়া।
লোক নিস্তারিতে যাই পাঁচালী রচিয়া।।
ভাগবত কথা যত লোক বুঝাইতে।
লৌকিক করিয়া কহি লৌকিকের মতে।।

তিনি দুটি কথা বললেন যা লক্ষণীয়— (ক) 'লোক-নিস্তারিতে', (খ) 'লৌকিকের মতে'। একই সঙ্গে লোকের নিস্তার ও লোকের মত, ঐশ্বর্যলীলা ও মধুর লীলার ইঙ্গিত এতে পাই। কারণ লোকের নিস্তার ঘটবে ঐশ্বর্যময় ভগবানের মাহাত্ম্য শুনে এবং লোকের মত অর্থাৎ মধুর রসে তাকে সিঞ্চিত করে দিতে চেয়েছেন।

শ্রীকৃষ্ণ বিজয়ের বৃন্দাবনলীলায় আদিরসের কিছু পরিবেশন থাকলেও তা বীর-রসাত্মক। কিন্তু মোটের উপর এই অনুবাদ বাক্যটি ভাগবতের ঐশ্বর্যাশ্রিত বীর রসাত্মক কৃষ্ণলীলা। কৃষ্ণের পৌরুষ ব্যঞ্জক সমুন্নত চরিত্র। তাঁর বীর্যময় সত্তাই প্রধান। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত কেবল কৃষ্ণলীলা কাহিনী কাব্য ও কৃষ্ণজীবনী মাত্র নয়, আরও অনেক কাহিনী প্রসঙ্গ, তত্ত্বদর্শন, ইতিহাস কিংবদন্তি প্রভৃতি। পরিবেশিত হয়েছে।

মালাধর বসুর কৃষ্ণ-চরিত্রে সে যুগের মানসিকতার ছাপ পড়েছে। তুর্কী আক্রমণের ধ্বংস ও অরাজকতার তান্ডবলীলার পর সদ্য জাগ্রত বাঙালী জাতির সামনে একটি আদর্শ বাহিনী ও সমুন্নত চরিত্র উপস্থাপনার প্রেরণাকেই কবি এ জাতীয় অনুবাদ কর্মকে বেছে নিয়েছেন বলেই মনে হয়। বিদেশী শাসন শক্তি সামনে ভীত, সন্ত্রস্ত ও বিমূঢ় জাতিকে উদ্বুদ্ধ করে তোলার পক্ষে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের গৌরবময় বীরত্ব ও ঐশ্বর্যের বর্ণাঢ্যতায় প্রদীপ্ত চরিত কথা লোক নিস্তারের পক্ষে শ্রেষ্ঠ বলে তিনি মনে করেছিলেন। ব্রিটিশ পরাধীন জাতির সামনে বঙ্কিমচন্দ্র ও কৃষ্ণচরিত্রকে আবার তুলে ধরেছিলেন— জাতিকে বীর্যকতায় প্রতিষ্ঠিত করতে।

''ম্লেচ্ছ জাতি রাজা হব অধর্ম পালিব,
জার ধন দেখিব তার সব ধরিলব।।"

সে যুগের বিশৃঙ্খল অবস্থাকেই সূচিত করে।

কবি মূল ভাগবতের সমগ্র কাহিনীকে অবলম্বন করেননি। তিনি চেয়েছেন, 'লোকের নিস্তার'— তা কেবল হতে পারে কৃষ্ণের বর্ণময় ঐশ্বর্যলীলা প্রকাশেই। তাই তিনি কেবলমাত্র কৃষ্ণকথাকেই প্রধান অবলম্বন করেছেন, তাঁর বাক্য তিন পর্যায়ে বিভক্ত। আদ্যবাহিনী - মধ্যবাহিনী এবং অন্ত বাহিনী বা লীলা। আদ্য অংশে বৃন্দাবন লীলার বর্ণনা ভারাবক্ষতা বসুমতীর ভারহরণের জন্য সত্যধামে বিষ্ণুর অবতার কৃষ্ণের আবির্ভাব। বসুদেব-দেবকীর অষ্টমগর্ভের সন্তান রূপে। অত্যাচারী কংসের কারাগারে তারা বন্দী। একে একে দেবকীর ছয় পুত্রের কংস কর্তৃক বিনাশ। সপ্তম গর্ভের গর্ভপাত হলে দেবকীর জঠর ত্যাগ করে রোহিনীজঠরে স্থান লাভ, অষ্টমগর্ভে ভগবান বিষ্ণুর কৃষ্ণরূপে জন্ম। নন্দালয়ে কৃষ্ণের উপস্থিতি, যশোদাগর্ভে মহামায়া জন্ম, মহামায়াকে দেবকীর কন্যা বলে প্রচার, কংস কর্তৃক মহামায়াকে শিলাপটে নিক্ষেপ, দৈববাণী, শিশু কৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলা, পূতনা বধ, কালিয় দমন, অজুন উদ্ধার, বকাসুর বধ, অখাসুর বধ, কৃষ্ণের দাবাগ্নি পান, প্রলম্বাসুর বধ, বসত্র হরণ, রসলীলা, মানভঞ্জন, আর অরিষ্ঠাসুর বধ, বেশী বধ, ব্যোমাসুর বধ— অক্রুর আগমণ, কৃষ্ণ-বলরামের কংস বধার্থে- মথুরাগমন। এমনই তাঁর ঐশ্বর্যলীলাকেই প্রকট করে।

মধ্যবাহিনীতে আছে মথুরালীলা। কৃষ্ণকর্তৃক কংসের রজক নিধন, কংসের যজ্ঞভঙ্গ, রাম ও কৃষ্ণের কংসের সভায় উপস্থিতি, কংসের হস্তীবধ, চানুর বধ, মুষ্টিকবধ, কংসবধ, কংস পিতা উগ্রসেনকে পুনঃ সিংহাসন দান, দেবকী-বসুদেবের সঙ্গে মিলন। সন্দীপ মুনির কাছে দুই ভাইয়ের বিদ্যাশিক্ষালাভ, পুনঃ মথুরাগমনাদি লীলা পশ্চিম সমুদ্রে জলদুর্গের মধ্যে দ্বারকাপুরী নির্যাসের সংকল্প।

অন্ত্যকাহিনীরা দ্বারবালীলায় আছে বিশ্বকর্ম কর্তৃক দ্বারকাপুরী নির্মাণ, কৃষ্ণের হরণ, পুত্র প্রদ্যুম্নের জন্ম, হস্তিনাপুর গমন, কালিন্দী, মিত্র বিন্দা, ভদ্রাকে বিবাহ, নরকাসুর বধ, নরকাসুরের বন্দিনী একহাজার একটা রমণীকে কৃষ্ণের বিবাহ, পত্নীগণ নিয়ে তাঁর দ্বারকা অবস্থান। সত্যভামার অনুরোধে পারিজাত লাভের জন্য ইন্দ্রের সঙ্গে বিরোধ, বাণের সঙ্গে যুদ্ধ ও সন্ধি। কৃষ্ণের সাধনতত্ত্ব ব্যাখযা— দ্বারকাপুরী ধ্বংস, যদুবংশ নিধন। কৃষ্ণের বাণবিদ্ধ মৃত্যু ইত্যাদি নানা ঘটনায় কৃষ্ণকথার সমাপ্তি।

মালাধর গভীর নিষ্ঠায় ভাগবতকে অনুসরণ করেছেন। এই রকম নিষ্ঠা সে যুগের কোন অনুবাদকের মধ্যে আমরা দেখি না। কাহিনী বিশ্লেষণ করলে দেখতে পাই কবি

মন্তব্য

কৃষ্ণের বলপ্রতাপ ও ঐশ্বর্যের কথাই অধিকতর বিস্তৃত আকারে বর্ণনা করেছেন। তিনি বৃন্দাবনের গোপীলীলা ও রাসলীলা সংক্ষেপেই মেরেছেন। তিনি বিদগ্ধ, সংস্কৃতজ্ঞ ছিলেন, মূল ভাগবতকে পুঙ্ক্ষানুপুঙ্ক্ষ অনুসরণ করেছেন। ভাগবত বহির্ভূত রাধাকৃষ্ণলীলার প্রাধান্য সম্বলিত শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের পুঁথি পাওয়া গেছে, তবে তা অর্বাচীন, প্রাচীন পুঁথিতে রাধা প্রসঙ্গ নেই বললেই চলে।

বাক্যটিতে উচ্চ কবিত্বশক্তি খুঁজে পাওয়া যায় না। কিন্তু কবির ভক্ত হৃদয়ের ঐকান্তিক আবেগ ও নিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায়। মনে হয় চৈতন্যদেব মালাধরের কাব্যে এই ভক্তি নিষ্ঠা খুঁজে পেয়েছিলেন বলেই তিনি এত উচ্ছ্বসিত ছিলেন। মধুরলীলা সামান্য থাকলেও মাধুর্যরসে সিক্ত। বৃন্দাবনলীলায় মথুরাগমনের পূর্বে গোপীদের বিলাপের এই অংশটি উদ্ধার করতে লোভ হয়—

''আর না যাইব সখী কল্পতুর মূলে।
আর কানু সঙ্গে সখী না গাঁথিব ফুলে।।
কৃষ্ণ গেলে মরিব সখী তাহে কিবা কাজে।
কৃষ্ণের সাক্ষাতে মেলে কৃষ্ণ পাবে লাজ।।
অল্প ধনলোভে লোকে এড়াইতে পারে।
বানু হেন ধন সখী ছাড়ি দিব কারে।।''

এই তো 'লৌকিকের মতে'। ঐশ্বর্যের সঙ্গে প্রেম মিলেমিশে গেছে।

শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে যে ভক্তি প্রকাশিত তা বাগবত বর্ণিত বৈধীভক্তি, চৈতন্য প্রবর্তিত বৈষ্ণব ভক্তি নয়। তবু 'নন্দের নন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ।' একটি পংক্তিতেই স্বয়ং মহাপ্রভু গুণরাজ খানের ভক্ত হৃদয়ের আন্তরিকতার স্পর্শ পেয়েছেন।

তবু শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের চলন কেবলমাত্র নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণ ও নিমিত্তে বৈষ্ণবদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। এর কারণ শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে চৈতন্য পরবর্তীকালের মধুরসের প্রাধান্য থাকেনি। 'পরকীয়া প্রেমে অতিরসের উল্লাস'— শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে নেই। সেখানে কৃষ্ণের ঐশ্বর্যলীলাই প্রধান। মধুররসের যে স্রোত চৈতন্য উত্তরকালে বাংলাদেশে বয়ে চলেছিল— সেখানে শ্রীকৃষ্ণবিজয় ভেসে গিয়েছে। নতুন করে স্রোত তুলতে পারেনি। তাই শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের পুথিঁও স্বল্প। সেজন্য যখন সমালোচকগণ বলেন শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের

ঐশ্বর্যলীলাই মুখ্য, মধুরলীলা গৌণ— তখন সে দাবীকে অস্বীকার করতে পারি না আমরা। মন্তব্য

৭.৫ আত্মমূল্যায়নধর্মী প্রশ্ন

১। ভাগবত অনুবাদ কম হওয়র কারণগুলি উল্লেখ করো।

২। মালাধর বসু তাঁর কাব্যে কাহিনী বিন্যাস করেছেন কতগুলি লীলায়?

৩। শ্রীকৃষ্ণ বিজয় কাব্যের *নন্দের নন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ* বাক্যটিতে প্রাণনাথ শব্দটি পরবর্তীকালে বৈষ্ণব ভক্তদের মনে কোন রসের উদ্রেক করে।

৪। অনুবাদক হিসেবে মালাধর বসুর বিশেষত্ব উল্লেখ করো।

৫। মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্যে ভক্তিপ্রসঙ্গ আলোচনা করো।

৬। মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে ঐশ্বর্য লীলাই মুখ্য মধুর লীলা গৌণ উল্লেখ করো।

৭.৬ সহায়ক গ্রন্থ

১। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত— ড. অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

২। বাংলা সাহিত্যের সমগ্র ইতিহাস— ড. ক্ষেত্র গুপ্ত

৩। বঙ্গ ভাষা ও সাহিত্য— ড. দীনেশ চন্দ্র সেন

৪। বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা— শ্রী ভূদেব চৌধুরী

৫। বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা (আদি ও মধ্য যুগ)--- শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়